

CHETANA LAHAR - Bengali Magazine of DAFODWAM
(Democratic Action Forum Of Dalits, Women & Minorities.)



একটি ত্রৈমাসিক বাংলা পত্রিকা

- অবহেলা যতদিন, সংরক্ষণ ততদিন
- শ্রেণী সংগ্রাম-শ্রেণী ঐক্য বজায় রেখে এস.সি., এস.টি, ও.বি.সি., সংখ্যালঘু, মহিলাদের অধিকার আন্দোলন গড়ে তুলুন
- সাম্রাজ্যবাদ, ব্রাহ্মণ্যবাদের কবল থেকে ভারতবাসীদের মুক্ত করুন
- উন্নয়নের বাহানায় অমানবিক উচ্ছেদ বন্ধ হোক
- বিদেশী পুঁজি বাজেয়াপ্ত করে ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের বিকাশ ঘটান

DAFODWAM thinks that India is a de facto upper caste Hindu state and Brahminism derived from MANU SMRITI is still the guiding philosophy of the Indian ruling classes. Untill the abolition of the caste system and discrimination based on gender and community there is no chance of the victory of class struggle in whatever form.

Beside taking programmes of rights of Dalits, Women and Minorities (Religious and Linguistics) DAFODWAM is in the area of publication of books on concerned subjects in different languages without support from any foreign / Government(s) fund.

For Correspondence :

ananta acharya
DAFODWAM
30/2, N. P. Road, Kolkata - 700 055
West Bengal, India
Ph : (0) 9331858854

E-mail : dafodwam.dafodwam@gmail.com
chetanalahar@rediffmail.com

Exchange Price : 70/-

Edited and Published by ananta acharya on behalf of DAFODWAM
30/2, N. P. Road, Kolkata - 700 055, and Printed at Sankar Mudran - 4, D.P.S. Rd., Kolkata - 700 033



বর্ষ - ৫ • যুগ্ম সংখ্যা - জুলাই ২০১৫ - ডিসেম্বর ২০১৫

Combined Issue CHETANA LAHAR

Year - 5, No. - 3 & 4

চৈতন্য
লাহার

— : সূচিপত্র : —

সম্পাদকীয় — ৩

প্রবন্ধ :

প্রায় মৃত হিন্দু — আশেদকর — ৫

নারী — পেরিয়্যার — ৭

সঙ্ঘাৎ শরণং গচ্ছামি — দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় — ১০

প্যারীচাঁদ মিত্র : বাঙলা গদ্যে ও কথাসাহিত্যে নতুন মাত্রা — রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য — ২৫

ভারতীয় রাষ্ট্রে জাত (caste) শ্রেণি সম্পর্ক —

উৎস ও বর্তমান অবস্থা — আলোক মুখোপাধ্যায় — ২৯

পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান-আন্দোলন : ক্লাবের থেকে ময়দানে — আশীষ লাহিড়ী — ৫৫

কে ভাই — মনোরঞ্জন ব্যাপারী — ৬৫

বিবেকানন্দের 'শূদ্র-জাগরণ' বা একটি আঘাতে গল্প — কণিক চৌধুরী — ৯০

এক পর্বের 'স্মরণীয় সংগঠন' এবং 'স্মরণীয় মানুষগণ' — সুনীল কুমার রায় — ১১৫

মে দিবস-এর প্রেক্ষাপটে ভারত-এর তিন তারকা

লোখাঙ্গে-সিনগ্রাভেলু-আশেদকর — সুশান্ত কুমার — ১২০

মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল — হৈপারন সেন — ১২৬

কবিতা :

মহানগর — অপাবৃত্তা ধরিত্রীকন্যা — ১৩৫

রণাঙ্গনে কে সেই মেয়ে/২ — নিতাই নন্দর — ১৩৬

পাবিদের সংলাপ — গালিব ইসলাম — ১৩৭

দিন — শ্যামল কুমার প্রামাণিক — ১৩৮

সীতাল — সৌগত চট্টোপাধ্যায় — ১৩৯

ঈশ্বর জন্ম নিচ্ছেন — কল্প গোস্বামী — ১৪০

গল্প :

অনিশ্চয়ের গল্প — সত্যসীতা গোস্বামী — ১৪২

সোতলায় মিদিয়া — দুলালকৃষ্ণ বিশ্বাস — ১৪৮

বাঁচা — স্বপন বিশ্বাস — ১৫৫

প্রবন্ধ :

বিশ্বায়নের শিকার — হর্ষবর্ধন চৌধুরী — ১৬৭

একটি নির্বোধ উইপোকার গীতা ভক্ষণ — অর্কপ্রভ সান্যাল — ১৭৭

কুমিরমারী বাঁপের এক মৌলো পরিবার — শঙ্করকুমার প্রামাণিক — ১৮০

বাজলি জীবনে নৌকা বাইছ ও সারিগান — সমুদ্র বিশ্বাস — ১৮৭

মতুয়ারা হিন্দু : মারাত্মক বিভ্রান্তি — জীবনকুমার সরকার — ২০৫

অনুপ্রবেশকারী — অনন্ত আচার্য — ২৪৩

সম্পাদকীয়

এ কোন সকাল

রাতের চেয়েও অন্ধকার

প্রতিদিন সকালে খবরের কাগজে চোখ বোলালে 'আজের দিন', 'স্বচ্ছ ভারত', 'পরিবর্তন', 'উন্নয়ন' প্রভৃতি শব্দগুলি অর্থহীন অস্পষ্ট মনে হয়। নারীদেহ মাত্রই ভোগ্য বা পণ্য, ধর্মশাস্ত্র তার মান্যতা দিলেও, সমাজ বা আইন তার যথোপচিত ভূমিকা পালন করে না কেন? মধ্যভারতের আদিবাসী বনবাসী জনগণ যখন তাদের প্রাণ বাজি রেখে দেশি বিদেশি শ্রেষ্ঠীদের গ্রাস থেকে জল জমি জংগল বাঁচাবার চেষ্টা চালাচ্ছেন, তখন 'অরণ্যের অধিকার' গ্রন্থের রচয়িতা সুশীল শিবির ত্যাগ করে শাষকের তোষাখানায় নাম লেখালেও, আদিবাসী সংগ্রাম থামছে না। যার দাঁত নখে এখনও গুজরাট সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের সংখ্যালঘুর রক্ত দেখা যায় তাকে প্রতিদিন সকালে রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে মানতে ঘৃণা হয়। ২০০৩ সালের লোকসভা রাজ্যসভায় গৃহীত বিলের ফলে যে ৩ কোটি দলিত উদ্বাস্তু বেনাগরিক হয়েছেন এই স্বচ্ছভারত তাঁদের কী দেবে? মণ্ডলকমিশনের সুপারিশ কেন এখনো কার্যকরী হলো না তার জবাব কে দেবে?

ক্ষমতার অলিন্দের উচ্ছিন্ন ভোগী যে সব তথাকথিত মার্কসবাদী, সমাজবাদী, আশ্বদকরবাদী গ্রহণযোগ্যতা হারাচ্ছেন তাদের সংশোধিত হবার আশা নেই বললেই চলে। তবুও শ্রেণী, জাত, ধর্ম, লিঙ্গ, ভাষা, মর্যাদার ভিত্তিতে যে সংগ্রামের, অসংগঠিত ভাবে হলেও, সূচনা হয়েছে তাকে বৃহত্তর গণতান্ত্রিক মোর্চা গঠনের প্রক্রিয়ায় সামিল করার কাজও শুরু হয়েছে। আর্থ রক্তের মিথ্যা অহমিকা নিয়ে হিটলার যখন ইন্দী আর কমিউনিস্টদের নিধন কর্মে ব্যস্ত ছিল তখন অনেকেই মনে করতেন হিটলার অপরাজেয়। এ যুগের হিটলার বাহিনীর নয়া আর্থ্যমীর বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক বৌদ্ধিক যুদ্ধ ঘোষণার অপেক্ষায়। রৌদ্র কিরণহীন এই সকালে সুসময়ের সূর্যালোক দেখা দেবে সেই আশায় বুক বাঁধতে হবে।

প্রায় মৃত হিন্দুত্ব

আম্বেদকর

ভাষান্তর : উৎসাহ আহমেদ

আমার মনে হয়, হিন্দু সমাজ নীতিগত পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে, যা এড়িয়ে চলা বিপজ্জনক। এবং প্রশ্ন হল, কে এই নীতিগত পুনর্গঠন এবং নিয়ন্ত্রণ স্থির করতে পারে? স্পষ্টত কেবল তাঁরাই, যারা বৌদ্ধিক পুনর্জন্ম অনুধাবন করেছেন এবং যারা চিন্তা-সংক্রান্ত বন্দিত্ব থেকে মুক্তির সাহস রাখার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সৎ। এই মূল্যমানের বিচারে আমার মতে, হিন্দু নেতারা এ কাজের জন্য একেবারে অযোগ্য। বলা অসম্ভব যে, তাঁরা বৌদ্ধিক পুনর্জন্মের প্রাথমিকতটুকুও অনুভব করেছেন। যদি তাঁরা বৌদ্ধিক পুনর্জন্ম অনুভব করে থাকেন, তা হলে অশিক্ষিত জনগণের মতো সহজভাবে তাঁরা নিজেদের প্রতারণা করতেন না অথবা অন্যের আদিম অজ্ঞতার সুযোগও গ্রহণ করতেন না, যেমন তাঁরা করছেন। হিন্দু সমাজের ঋণ-বিষণ্ড অবস্থা সত্ত্বেও এই সব নেতারা নির্লজ্জভাবে অতীতের আদর্শের কথা বলছেন, যেগুলি সবদিক থেকে বর্তমানের সঙ্গে সম্পর্কহীন। সেগুলি সৃষ্টির সময়ে উপযুক্ত থাকলেও, এখন পথ প্রদর্শনের বদলে বরং সতর্কীকরণে পরিবর্তিত হয়েছে। প্রাচীনত্বের কারণে সেগুলির প্রতি এখনও এক দুর্বোধ্য শ্রদ্ধা আছে, যা সমাজের ভিত্তি সম্পর্কে কোনও রকম যাচাই করার বিরোধী করে লোককে অনীহ করে রাখে। হিন্দু জনগণ অবশ্যই তাদের বিশ্বাস গঠনের ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্যভাবে অমনোযোগী। হিন্দু নেতারা এই ধরনের। এবং আরও খারাপ যে, হিন্দু নেতারা তাঁদের বিশ্বাসের প্রতি এক বিচিত্র আবেগে ভরে ওঠেন, যখন-ই কেউ ওই সব বিশ্বাসের সান্নিধ্য বর্জন করতে চায়। গাঙ্কিজীও তার ব্যতিক্রম নন। দেখে মনে হয়, গাঙ্কিজী চিন্তা-ভাবনায় আস্থা রাখেন না। তিনি সাধু-সন্তদের অনুসরণ করতে পছন্দ করেন। একজন রক্ষণশীল ব্যক্তি যেমন পবিত্র ধারণার প্রতি মনে শ্রদ্ধা পোষণ করে, তেমনি তিনি ভয় পান যে, একবার তিনি ভাবতে শুরু করলে বহু আদর্শ ও প্রতিষ্ঠান, যেগুলিকে তিনি আঁকড়ে ধরে আছেন, সে-সব ধ্বংস হবে। তাঁর প্রতি সকলের সহনুভূতি দেখানো উচিত। কারণ স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত সব কাজ স্পষ্টত, প্রচলিত জগতের কিছু অংশকে বিপদে ফেলে। কিন্তু এও সমান সত্য যে, সাধু-সন্তদের উপর নির্ভরশীলতা

আমাদের সত্যাত্মবোধের পথে চালিত করে না। সব সত্ত্বেও সাধু-সন্তরা মানুষমাত্র। লর্ড ব্যালফোর বলেছেন, “মানুষের মন একটি সত্যাত্মবোধ যন্ত্র, যা গুরোরের নাকের ডগার চেয়ে বেশি কিছু নয়।” এ পর্যন্ত তিনি যা চিন্তা করেন, তাতে আমার মনে হয়, তিনি প্রকৃতপক্ষে হিন্দুদের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থাকে সমর্থনের কারণ খুঁজতে তাঁর বুদ্ধিকে পণ্য করছেন। তিনি এর সবচেয়ে প্রভাবশালী সমর্থক এবং এই জন্য হিন্দুদের সর্বনিকৃষ্ট শত্রু।

গান্ধিজীর মতো নন, এমন অনেক হিন্দু নেতা আছেন, যারা কেবলমাত্র বিশ্বাস ও অনুসরণ মেনে চলেন না। তাঁরা ভাবতে সাহস করেন এবং নিজ ভাবনার ফল অনুযায়ী কাজ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, যখন জনগণকে সঠিক পথ দেখানোর সময় আসে, তখন তাঁরা হয় খুব অসং, অথবা একদম উদাসীন। প্রায় প্রত্যেক ব্রাহ্মণ-ই জাত-প্রথার নির্দেশ ভাঙে। জুতো বিক্রি করা ব্রাহ্মণের সংখ্যা যাজক কর্মে নিযুক্ত ব্রাহ্মণের চেয়ে অনেক বেশি। ব্যবসার জন্য ব্রাহ্মণরা তাদের পেশা যাজক কর্মকেই শুধু পরিত্যাগই করেনি, অধিকন্তু তারা এমন সব ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়েছে, যেগুলি শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। তা হলেও কত ব্রাহ্মণ, যারা প্রতিদিন জাত ভাঙে, জাতপ্রথা এবং শাস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচার চালায়। কারণ তার বাস্তব প্রবৃত্তি এবং নৈতিক বিবেক সেগুলির দৃঢ় ধারণাকে সমর্থন করতে পারে না। শত শত ব্রাহ্মণ আছে, যারা প্রতিদিন জাত ভাঙছে এবং শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করছে। কিন্তু যারা সবচেয়ে গোড়া, তারা জাতপ্রথার তত্ত্ব এবং শাস্ত্রের পবিত্রতা উঁচুতে তুলে ধরতে সচেষ্ট। কেন এই কপটতা? কারণ তারা বোঝে, যদি সাধারণ মানুষ জাত-ব্যবস্থার দাসত্ব থেকে মুক্তি পায়, তা হলে শ্রেণি হিসাবে ব্রাহ্মণদের মর্যাদা ও ক্ষমতার পক্ষে তারা আতঙ্ক হয়ে দাঁড়াবে। এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণি তাদের চিন্তার ফসল সাধারণ মানুষকে দিতে অস্বীকার করে এবং তাদের এই অসততা এক ঘৃণ্য প্রবণতা।

ম্যাথু আর্নল্ডের ভাষায়, হিন্দুরা “দুটি জগতে বিচরণশীল। একটি মৃত, অপরটি জন্মাবার শক্তিহীন।” তারা কী করবে? তারা যীর কাছে নেতৃত্বের জন্য আবেদন জানায়, সেই গান্ধিজী চিন্তায় বিশ্বাস করেন না। সুতরাং এমন কোনও নির্দেশ তিনি দিতে পারেন না, যা বলা যায়, অভিজ্ঞতার দ্বারা পরীক্ষিত। যে বুদ্ধিজীবী শ্রেণির কাছে সাধারণ মানুষ শিশু খোঁজে, তারা হয় প্রচণ্ড অসং অথবা সঠিক পথে তাদের শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে অতি উদাসীন। আমরা সত্যিই এক দারুণ ট্রাজেডির দ্বারা। এই ট্রাজেডির সামনে সবাই যা করতে পারে, তা কেবল বিলাপ করা আর বলা—“হে হিন্দুগণ! তোমাদের নেতারা এ-রকমই।” □

নারী

পেরিয়ার

ভাষান্তর : দেবী চট্টোপাধ্যায়

নারীদের কী প্রকারের শিক্ষা প্রদান করা হবে, তা নিয়ে বিভিন্নজন বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করছেন। তবে, নারীরা কেবল প্রগতিশীল লোকেদেরই মতামত গ্রহণ করতে প্রস্তুত, পশ্চাদগামী লোকেদের মতামত নয়।

যারা প্রগতিশীল নয় এমন মতামত পোষণ করেন, তারা বলেন, “ভারতীয় নারীরা এ পর্যন্ত যেমন ছিলেন, তেমনই থেকে যান, তাদের নিজেদের স্বাধীন মতামত বর্জন করে, শুধু স্বামীর কল্যাণের কথা বিবেচনা করে, প্রাচীন প্রথাপকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে যে ‘স্বামী হচ্ছেন স্বামী, তা তিনি পাথরই হোন বা ঘাসের যাই হোন না কেন’, নারীরা সন্তানের জন্ম দেয় আর তাদের লালন-পালন করে। এটাই তাদের জন্য শ্রেষ্ঠতম জীবন। এই সংস্কৃতিই তাদের প্রয়োজন, তারা যদি এর বাইরে যান, তাহলে তাদের সামাজিক জীবনের স্তর নীচে নেমে যাবে। সতী ধর্ম হারিয়ে যাবে এবং প্রকৃতপক্ষে এমন কি ভারতীয় সভ্যতাই হারিয়ে যাবে। সুতরাং যদি তাদের ধর্মীয় শিক্ষা এবং পরিবার প্রতিপালনের শিক্ষা দেওয়া হয়, সেটাই যথেষ্ট হবে।” এ ধরনের মতামত যারা ব্যক্ত করেন, আমরা, তাঁদের নিয়ে আদৌ চিন্তিত নই। যখন তারা তাঁদের আত্মস্বার্থের কথা বিবেচনা করেন, তখন তারা এর চেয়ে ভালো মতামত ব্যক্ত করতে পারেন না। যদি তাঁরা প্রগতিশীল মতামত রাখতে থাকেন, তাহলে তাঁদের নিজস্ব স্বার্থ অবশ্যই বিপন্ন হবে।

কিন্তু যদি নারীরা এরূপ মতামত ব্যক্ত করেন, তাহলে তা হবে একটা আশ্চর্যের বিষয়। তাঁরা যদি গুরুত্ব বলেন, তাহলে আমাদের সিদ্ধান্ত টানতে হবে যে তাঁদের কথার পিছনে কোন চতুর ফন্দি আছে।

কয়েকদিন আগে লন্ডনের লিসিয়াম ক্লাবে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় নারী সমিতির বার্ষিক নিবস পালন উপলক্ষে মাদ্রাজ মহিলা কলেজের অধ্যাপক শ্রীমতী ম্যাকডোকোল এক বক্তৃতা দেন। বক্তৃতায় তিনি বলেন, “নারীদের উচ্চতর শিক্ষা পুরোটাই ভাল ফল দেবে, তা আমরা বলতে পারি না। ভারতীয় নারীরা ভক্তি ও

ইচ্ছাশক্তির জন্য প্রসিদ্ধ। তাদের পরিবারের প্রতি রয়েছে গভীর আকর্ষণ। তারা যদি পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তাহলে ভারতীয় সামাজিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই, উচ্চতর শিক্ষার সাথে সাথে, তাদেরকে খ্রীষ্টধর্মের উচ্চনীতিমালা সম্বন্ধেও শিক্ষা দেওয়া উচিত হবে। নতুবা উচ্চতর শিক্ষা তাদেরকে বড় বিপদের মধ্যে ফেলবে।"

এক সুসভ্য পাশ্চাত্য দেশের মহিলা হয়ে শ্রীমতী ম্যাকডোকেল এইরকম বক্তব্য বলেছেন বলে আমরা খেদ প্রকাশ না করে পারি না। কেন এই ভদ্রমহিলা ভারতীয় নারীদের সামাজিক জীবন নিয়ে এত গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, তা যদি আমরা খুঁটিয়ে দেখি, তাহলে আমাদের এই সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে, তাঁর বক্তৃতার পিছনে এক সুস্থ রণনীতি রয়েছে। উচ্চ শিক্ষার সাথে খ্রীষ্টধর্মের উচ্চনীতিমালার শিক্ষাকে যুক্ত করার বিষয়ে তার নিজের কথাই তার রণনীতি বা সুস্থ প্রজ্ঞা ফন্দী প্রকাশ করে ফেলেছে। তাই, আমাদের বলতে হচ্ছে যে তার বক্তৃতা ভারতে খ্রীষ্টধর্ম বিস্তারের প্রচার বক্তৃতা ছাড়া আর কিছুই না।

নারীদের একমাত্র উপযুক্ত কাজ হচ্ছে গার্হস্থ্য কাজকর্মের দাসত্ব করা, সন্তান-ধারণ ও তাদের প্রতিপালন করা, এই ধারণাটাই ভ্রমাত্মক। যতদিন নারীদের উপর এইরূপ বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে, ততদিন, আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, নারীদের পুরুষের তাঁবে থাকতে হবে ও সাহায্যের জন্য পুরুষের উপর নির্ভর করতে হবে। যদি নারীদের পুরুষের সাথে সমতার ভিত্তিতে জীবনযাপন করতে হয়, তাহলে পুরুষের মত নারীদের অবশ্যই তাদের পছন্দের শিক্ষার ব্যাপারে ও তাদের জ্ঞান, সামর্থ্য ও রুচির সাথে খাপ খাইয়ে যে কোনও কাজ অবাধে করার ব্যাপারে স্বাধীনতা থাকতে হবে। তদুপরি, আমার অভিমত, তারা কিছুতেই ধর্মীয় অভিমত গুনতে যাবেন না। আমি বারংবার বলে আসছি, ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান আছে এমন পুরুষেরা পর্যন্ত দাসত্বের মনোবৃত্তি ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসের দগ্ধ কেনন শোচনীয়ভাবে সংকটাপন্ন হয়ে পড়েন। আমি সর্বত্র লোকদের বলেছি যে, আমাদের চিরকালের মত ধর্মের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে হবে, কারণ কেবলমাত্র এর জন্যই লোকেরা ভীর্ণতা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস আর আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভরে আছে। এমনভাবেই আমি কি করে, মানতে পারি যে, নারীদের অবশ্যই ধর্মীয় শিক্ষা দিতে হবে?

যারা ধর্ম সম্বন্ধে কোনও শিক্ষা পায়নি, কিন্তু শুনে শুনে ও ধর্মীয় রীতিনীতি

পালন করে করে অন্ধ-বিস্তর শিখেছে সেই নারীদের অবস্থা যদি আমরা ভাল করে দেখি, তাহলে আমরা বুঝতে পারি ধর্মের প্রভাব কত খারাপ। কে অস্বীকার করতে পারে, ধর্মই আমাদের নারীদের মধ্যে দাসত্বের মনোভাব, ভীর্ণতা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন রীতিনীতি অবলম্বন করার একগুঁয়েমি ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাই আমরা কখনোই সেই লোকদের মত মানতে পারি না, যারা বলেন যে নারীদের ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া উচিত।

নারীদের পুরুষের মত শারীরিক শক্তির বিকাশ ঘটানো উচিত। তাদের অবশ্যই ব্যায়াম করা ও অস্ত্রের ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত। তাদের অবশ্যই কোনও যৌন উন্মাদ ব্যক্তির দ্বারা স্ত্রীলতাহানির চেষ্টা থেকে নিজেদের রক্ষার সামর্থ্য অর্জন করতে হবে। প্রয়োজনে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে ও শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াবার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ তাদের পাওয়া উচিত। এটা হচ্ছে সভ্য মানুষের মত। নারীরাও এই মতকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। বিশ্বের সাধারণ মতামত যখন এরকম, তখন নারীদের উচ্চশিক্ষা দেওয়া নিরর্থক বলে কিছু লোক যে বক্তব্য রাখেন তাকে কে স্বীকার করতে পারে?

কিন্তু, আমি একমত যে বর্তমান শিক্ষা খুবই বাজে। এটা সত্য, যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তা লোককে কেবল কেঁরানী হওয়ার প্রশিক্ষণই দেয় এবং তা লোকের বাস্তব জীবনে কোনও কাজে লাগে না। তাই বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে পাল্টানো উচিত এবং এক ভিন্ন শিক্ষা-ব্যবস্থা যা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই অভিন্ন হবে, যা বাস্তব জীবনে কার্যকর হবে এবং যা লোককে কাপুরুষতা ও ধর্মবিশ্বাস থেকে মুক্ত হতে সক্ষম করবে, তা গ্রহণ করতে হবে। □

(১৭.৭. ১৯৩২ তারিখে 'কুরি আরাসু'তে পেরিয়ার লিখিত প্রবন্ধ)

সঙ্ঘঃ শরণঃ গচ্ছামি

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের সামাজিক ভূমিকা নিয়ে আধুনিক বিদ্যানমহলে গভীর মতবিরোধ আছে। একটা মত হল, গৌতম ছিলেন নিপীড়িত মানুষদের প্রতিনিধি, আদিপর্বে বৌদ্ধধর্ম তাই এক বিপুল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করেছিল। অপর মতে, গৌতম ছিলেন দীনহীনের প্রতি উদাসীন—তার আসল সম্পর্ক ধনী এবং অভিজাত শ্রেণির সঙ্গেই।

মত দুটি পরস্পরবিরোধী। কিন্তু প্রথম মতের সঙ্গে রিস্ ডেভিড্‌স্ এবং দ্বিতীয় মতের সঙ্গে ওলডেনবার্গ-এর নাম জড়িত। বৌদ্ধশাস্ত্রবিৎ হিসেবে উভয়েই এতখানি শ্রদ্ধের যে কারণ কথাই আমরা অসংকোচে অগ্রাহ্য করতে পারি না।

আমরা দেখাবার চেষ্টা করব, এই মতবিরোধের মূল কারণ বৌদ্ধ শাস্ত্রবিদ্যে কোনো পক্ষেরই জ্ঞানের অভাব নয়। কিন্তু উভয়পক্ষই প্রাচীন-সমাজ-সংক্রান্ত সাধারণভাবে জানতে পারা তথ্যের প্রতি উদাসীন : এ-বিষয়ে মর্গানের গবেষণা আধুনিক বিদ্যানমহলে উপযুক্ত মর্যাদা পায়নি, ফলে আদিম-সাম্যবাদের ধারণাটুকুই অনেক ক্ষেত্রে অস্পষ্ট—এমনকি অজ্ঞাত বা অস্বীকৃত। আমাদের যুক্তি হবে, প্রাচীন সমাজকে সম্যকভাবে চেনবার ভিত্তিতে আমরা যদি পুরনো পুঁথিপত্রের তথ্যগুলি বিচার করতে সম্মত হই তাহলে তার উপর নতুন আলোকপাত হতে পারে।

115 11

প্রথমে দেখা যাক আধুনিক বিদ্যানমহলে এ-বিষয়ে মতবিরোধটা কত গভীর।

কোনো কোনো বিদ্বান মনে করেন, গৌতম ছিলেন “সার্বক রাজনৈতিক সংস্কারক। দীনহীনের পক্ষ নিয়ে তিনি ধনী ও অভিজাতিক শ্রেণির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন এবং জাতিভেদ নির্মূল করবার আয়োজন করেছিলেন।”

এই মতের সমর্থনে নানা রকম তথ্যের সমর্থন দেখানো যায়।

শ্রমপদের উপদেশ দিয়ে গৌতম বলেছেন, গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি মহানদীগুলি যতই

পৃথক হোক না কেন, মহাসমুদ্রে প্রবেশের পর সেগুলি তাদের পুরনো নাম এবং পুরনো উৎসের স্বাতন্ত্র্য হারায়—তখন তাদের একমাত্র নাম হয় মহাসমুদ্র, — তেমনই ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র এই চারবর্ণের মানুষ যখন ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ নেয় তখন তারাও তাদের পুরনো নাম এবং পুরনো বংশপরিচয় হারিয়ে শাকা-পুত্রর অনুগামী শ্রমণ হিসেবে একমাত্র পরিচয় পায়।

গৌতমের সঙ্গে রাজা অজাতশত্রুর একটি কথোপকথনের উল্লেখ পাওয়া যায়, তার একমাত্র তাৎপর্য হল সঙ্ঘের কাষা-বসনের সামনে রাজা ও দাসের পার্থক্য বিলীন হয়। অজাতশত্রুকে গৌতম প্রশ্ন করেছেন, আপনার কোনো ভৃত্য বা দাস যদি সঙ্ঘের কাষা-বসন গ্রহণ করে তাহলে কি তারপরও আপনি তার কাছে পূর্বের মতো ভৃত্য বা দাসের ব্যবহার আশা করবেন? অজাতশত্রু বলেছেন, তা নয়, তখন আমি তার কাছে নত হব, ইত্যাদি।

বুদ্ধ জনগণের উদ্দেশ্যেই বাণী প্রচার করেছিলেন। আর এই কারণেই দেখা যায় তাঁর সঙ্ঘের মধ্যে হীনযোনি বা হীনজাতির অনেকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছেন। উপালি ছিলেন নাপিত, সুনীত পুঙ্কস নামের হীনজাতির মানুষ, সান্তি জেলোদের সন্তান, নন্দ গোয়াল, পঙ্ককবায়ের জন্ম এক উচ্চবর্ণের নারীর গর্ভে কিন্তু ক্রীতদাসের গুঁরসে; চাঁপা ছিলেন ব্যাথের মেয়ে, পুষ্পা ও পুষ্পিকা দাসীকন্যা, সুমঙ্গলমাতা চাটাইকারদের কন্যা, সুভা কামারের মেয়ে। রিস্ ডেভিড্‌স্ এই দৃষ্টান্তগুলির উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন এ-জাতীয় আরো বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা সম্ভব। তাঁর ধারণায়, তখনকার বাস্তব সমাজে হীনজাতি এবং হীনবৃত্তি মানুষের যে-অনুপাত ছিল বৌদ্ধসঙ্ঘের মধ্যেও মোটের উপর সেই রকমই অনুপাত। এবং এই জাতীয় দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন, বুদ্ধ তাঁর নিজের সঙ্ঘের মধ্যে—এবং এই সঙ্ঘের উপরই তাঁর পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল—জন্মগত ও শ্রেণীগত সমস্ত বাধাবিঘ্নকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

অপরপক্ষে, ওলডেনবার্গ-এর মন্তব্য কী রকম তীক্ষ্ণ তাই দেখা যাক। “কেউ যদি বৌদ্ধধর্মের গণতান্ত্রিক দিকের কথা বলতে চান তাহলে তাঁর পক্ষে মনে রাখা প্রয়োজন যে জাতীয় জীবনকে কোনোভাবে সংস্কার করবার উৎসাহের সঙ্গে... এই সঙ্ঘের কোনো সম্পর্ক ছিল না। বৌদ্ধ প্রভাবের ফলে ভারতবর্ষে সামাজিক অভ্যুত্থান ধরনের কোনো কিছুই ঘটেনি। ... রাষ্ট্র ও সমাজ যেমন আছে তেমনই

থাকুক। যারা ধর্মের শরণ নিয়ে সংসার ত্যাগ করেছেন তাঁদের পক্ষে পৃথিবীর দুঃখদুর্দশা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। যারা সংসারে রইল তাদের জীবনে জাতিভেদের নিয়ম-কানূনের জন্যে যা-দুঃখকষ্ট তা দূর করা বা কমানোর জন্য নিজের প্রভাবকে প্রয়োগ করবার কথা বুদ্ধের কাছে কখনোই উদ্ভিত হয় না।”

সত্ত্বং নেতারা প্রধানতই ধনী ও অভিজাত বংশের মানুষ। যে-দুজন সর্ব প্রথম বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা উভয়েই শ্রেষ্ঠী তারপর উল্লেখযোগ্য নাম পাওয়া যায় কাশীর এক অত্যন্ত ধনী পরিবারের এবং সেই ধনী পরিবারটিকে কেন্দ্র করে বুদ্ধ কাশ্যপ ও সম্রাটদের। তারপর উরুবিল্লয় অলৌকিক শক্তির প্রতাপ প্রদর্শন করে বুদ্ধ কাশ্যপ বংশের ব্রাহ্মণদের মন জয় করেন। উরুবিল্ল থেকে রাজগৃহ—সেখানে মগধরাজ বিম্বিসার বুদ্ধকে প্রণতি জানান। এই রাজগৃহতেই সারিপুত্ত এবং মোগ্গল্লান—দুজনেই ব্রাহ্মণ—বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই হল প্রথম দিককার কিছু কিছু শিষ্যের নমুনা আর এঁরা সকলেই বণিক, ব্রাহ্মণ বা রাজা।

এর সঙ্গে মগধ রাজ্যের সাধারণ মানুষদের মনোভাবটা তুলনা করা যায়। তখন মগধের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছে। ফলে জনসাধারণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট—তারা কানাকানি করে, রেগে যায়, বলে সম্রাসী গৌতম আমাদের সন্তানহীন করতে এসেছে, সম্রাসী গৌতম আমাদের বৈধব্য এনেছে, সম্রাসী গৌতম আমাদের ঘর ভাঙতে এসেছে—গণআন্দোলনের নেতার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চয়ই এ-রকম হয় না।

ভাষাভাষা, স্বাক্ষর অর্থাৎ হিসেবে রাজা এবং শ্রেষ্ঠীরা বুদ্ধের জন্য যে বিপুল অর্থ ব্যয় করেছিলেন তার কথাও অগ্রাহ্য করা যায় না। রাজা বিম্বিসার বেণুকন বলে তাঁর নিজের প্রমোদ-উদ্যান বুদ্ধকে উপহার দেন, অনাথপিণ্ড নামের অসামান্য ধনী শ্রেষ্ঠী উপহার দেন জেতবন বলে প্রমোদ-উদ্যান। এই প্রমোদ-উদ্যান আগে ছিল এক রাজপুত্রের। অনাথপিণ্ড এটি বুদ্ধকে উপহার দেবার জন্য কিনতে চান, কিন্তু রাজপুত্র বিক্রি করতে রাজি নন। অনেক দরাদরি হয়, এবং শেষ পর্যন্ত দর ঠিক হয়, পুরো প্রমোদ-উদ্যানটিকে ঢেকে ফেলার জন্যে যত স্বর্ণমুদ্রা লাগবে—তাই। মূল্য খুব কম নয়।

সত্ত্বং প্রবেশ করবার অধিকার-সংক্রান্ত কতকগুলি নিয়মের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। যেমন, পলাতক ক্রীতদাস সত্ত্বং প্রবেশ করতে পারবে না,

পলাতক সৈনিকেরও সে অধিকার নেই। এই জাতীয় নিয়ম থেকেও বোঝা যায় সত্ত্বং কায়মী স্বার্থের খুব বেশি বিরোধিতা করতে রাজি হননি।

১২১

দুটি বিরুদ্ধ-মতের উল্লেখ করা গেল। বৌদ্ধশাস্ত্র থেকে প্রথম মতটির সমর্থনে আরো যুক্তি ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়তো কঠিন নয় এবং দ্বিতীয় মতটির বিরুদ্ধে হয়তো তর্ক করে বলা যায় যে, যে-তথ্যের ভিত্তিতে এটি প্রতিষ্ঠিত তার প্রকৃত তাৎপর্য অন্য রকম হতে পারে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে আমরা ওই মতবিরোধের মীমাংসা করবার চেষ্টা করব না। কেননা, প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম সত্যিই গণতান্ত্রিক ছিল কিনা, এ-প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আরো মৌলিক একটি প্রশ্নের উত্তর আগে পাওয়া দরকার।

গৌতম বুদ্ধ আধুনিক পৃথিবীর মানুষ নন। তাই আধুনিক পৃথিবীতে আমরা গণতন্ত্র বলতে যা বুঝি বুদ্ধের সময়েও যে তাই-ই বোঝাত, একথা কল্পনা করবার কারণ নেই। আদিপর্বের বৌদ্ধধর্ম সত্যিই গণতান্ত্রিক আন্দোলন ছিল কিনা—এ-প্রশ্নের মীমাংসা করতে হলে আরো দুটি প্রশ্ন তোলা দরকার।

এক : তখনকার পৃথিবীতে গণতন্ত্র বলতে ঠিক কী বোঝানো সম্ভবপর ছিল? কিংবা গৌতম বুদ্ধের পক্ষে গণতন্ত্র হিসেবে ঠিক কোন ধরনের সংগঠনকে চেনা সম্ভব ছিল?

দুই : গণতান্ত্রিক সংগঠন হিসেবে বুদ্ধের পক্ষে একমাত্র যে-জাতীয় সংগঠনকে চেনা সম্ভব, তার প্রতি তাঁর প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি কী রকম ছিল?

আমরা এই দুটি প্রশ্নের নিম্নোক্ত উত্তর দেবার চেষ্টা করব।

এক : প্রাচীন পৃথিবীতে গণতন্ত্রের একমাত্র যে-রূপটির পরিচয় সম্ভবপর তা হল তথাকথিত ট্রাইব্যাল গণতন্ত্র। ‘তথাকথিত’ শব্দ ব্যবহার করছি, তার কারণ আধুনিক যুগে আমরা গণতন্ত্র বলতে একরকম রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি থাকি এবং রাষ্ট্রীয়ত্বের মূল উদ্দেশ্য হল একটি শ্রেণির পক্ষে অপরাপর শ্রেণিকে জোর করে অবলম্বন করে রাখবার আয়োজন। কিন্তু ট্রাইব্যাল সমাজ—অর্থাৎ, ট্রাইব্যাল সমাজ যতদিন পর্যন্ত আদি-অকৃত্রিম রূপে বর্তমান থাকে,—আসলে হল প্রাক-বিভক্ত সমাজ। তার মধ্যে শ্রেণিবিভাগ ফুটে ওঠেনি; তাই কোনো এক শ্রেণির পক্ষে অপরাপর

শ্রেণিকে অবদমন করবার সম্ভাবনাও দেখা দেয়নি। তার সঙ্গে গণতন্ত্রের সাদৃশ্য শুধু এইদিক থেকে যে প্রকৃত ট্রাইব্যাল সমাজেরও মূলমন্ত্র হল সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা। এবং মনে রাখা দরকার যে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার অমন চূড়ান্ত বিকাশ ঐতিহাসিকভাবে আমাদের জন্য কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মাথোঁই দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। এই কারণেই, গণতন্ত্রর কলমে এর সঠিক বর্ণনা হিসেবে আদিম সাম্য-সমাজ বা প্রিমিটিভ কমিউনিজম্ পরিভাষাটি ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়।

দুই : এই জাতীয় আদিম সাম্যসমাজই গৌতম বুদ্ধর কাছে সত্ত্ব গঠনের প্রধানতম প্রেরণা ছিল। তিনি সচেতনভাবেই ওই আদিম সাম্যসমাজের সংগঠনকে অনুকরণ করবার চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু এর থেকে আমরা যদি অনুমান করি যে গৌতম বুদ্ধ নিজে সাম্যবাদী বা কমিউনিস্ট ছিলেন তাহলে ঠিক যে আন্তির বিরুদ্ধে আমাদের মন্তব্য, আমরা নিজেরাও তারই পুনরুৎসাহ করে বসব। আন্তিটি হল, প্রাচীন পৃথিবীর মাঝে আধুনিক পৃথিবীকে আবিষ্কার করা, বা, আধুনিক রাজনীতির ধ্যানধারণা দিয়েই প্রাচীন বাস্তবকে সনাক্ত করা। আদিম সাম্যবাদ এবং আধুনিক অর্থে সাম্যবাদ এক নয়—উভয়ের মাঝে গুণগত পার্থক্য, যেমন পার্থক্য পাথর-বুগের হাতিয়ারের সঙ্গে আজকের কলকারখানার। এই দুয়ের মাঝে প্রথমটাই ছিল গৌতম বুদ্ধর কাছে মূল অনুপ্রেরণার উৎস। তাই আধুনিক অর্থে তাঁকে সাম্যবাদী বলে কল্পনা করা সম্পূর্ণ ভুল হবে।

অপরপক্ষে এইদিক থেকে চিন্তা করলে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের যেটা প্রকৃত গৌরব আর যেটা প্রকৃত সংকীর্ণতা—দুইই বুঝতে পারা যেতে পারে। সংকীর্ণতার দিকটা অস্পষ্ট নয়। মৌলিক সমাজ-বিপ্লবের রূপ পাকার বদলে আদি বৌদ্ধধর্ম শেষ পর্যন্ত তার নিজস্ব অতীতের বিপরীত পর্যবসিত হল, হয়ে নীড়াল এক রাষ্ট্রধর্ম : যে হিংসা, লোভ, মিথ্যা, অসাধুতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে তার জন্ম হয়েছিল সেগুলিরই জ্বালা-সন্ত্রশকে স্বীকার করে নেবার বা সহ্য করতে পারবার জন্যে যেন এক মানকতার মতো। কিন্তু তাই বলে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের গৌরবের দিকটার কথাও ভুলে গেলে চলবে না। প্রাকবিভক্ত সমাজ থেকে প্রেরণা পেয়েছিল বলেই প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম মতাদর্শ ও সংগঠন উভয় দিক থেকেই সামগ্রিকভাবে শ্রেণিসমাজের আন্তি বা মোহ থেকে বিমুক্ত ছিল। আর সেইটাই হল প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত গৌরবের

৮৮।

[৩।]

আলোচনার সুবিধের জন্যই আমরা উপরোক্ত দুটি প্রশ্নের দ্বিতীয়টি থেকেই শুরু করব : ট্রাইব্যাল সমাজের প্রতি বুদ্ধের মনোভাবটা কী রকম ছিল? মগধপ্রিন্সেরাও সূত্রের শুরুতেই এ-প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়।

মগধরাজ অজাতশত্রু বজ্জি বলে একটি ট্রাইবের বিরুদ্ধে অভিযানের পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি তাঁর প্রধানমন্ত্রী ব্রাহ্মণ বর্ষকারকে বুদ্ধর কাছে পাঠালেন, এই অভিযানের ফলাফল-সংক্রান্ত ভবিষ্যৎবাণী বুদ্ধর মুখ থেকে শুনে আসবার জন্য। ব্রাহ্মণ বর্ষকার বুদ্ধর কাছে গিয়ে রাজার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। তখন আনন্দ তথাগতর নিছনে দাঁড়িয়ে বাতাস করছিলেন। বুদ্ধ রাজমন্ত্রীর কথা শুনলেন, কিন্তু দগাসরি তাঁকে কোনো উত্তর দিলেন না। তার বদলে তিনি আনন্দকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি জানো, আনন্দ, এই বজ্জিরা প্রায়ই একত্রে সমাবিষ্ট হয় এবং সভায় গমন করে? আনন্দ বললেন, শুনেছি। তথাগত বললেন, বজ্জিরা যতদিন এইভাবে প্রায় সমবেত হবে এবং সভায় উপস্থিত হবে ততদিন, তাদের অবনতি হবে না—উন্নতিই হবে।

এইভাবে পরপর আনন্দকে প্রশ্ন করে এবং আনন্দের কাছ থেকে উত্তর পেয়ে তথাগত ওই বজ্জিদের উন্নতি ও সমৃদ্ধির সাতটি শর্তের কথা আলোচনা করলেন : যতদিন ওরা একত্রে মিলিত হবে, একত্রে উঠবে, একত্রিতভাবে উদ্দেশ্য সাধনের প্রচেষ্টা করবে—ইত্যাদি ইত্যাদি—ততদিন তাদের উন্নতিই হবে, সমৃদ্ধিই বাড়বে। আলোচনাটি স্পষ্টই ট্রাইব্যাল সমাজের গণ-বন্ধনের বর্ণনা।

তারপর তথাগত ব্রাহ্মণ বর্ষকারকে বললেন, আমি যখন বৈশালীর সারন্দব বিহারে ছিলাম তখন বজ্জিদের উন্নতির এই শর্তগুলি তাদের শিখিয়েছিলাম। এবং ততদিন পর্যন্ত তাদের মধ্যে এই শর্তগুলি বর্তমান থাকবে ততদিন পর্যন্ত তাদের অবনতির বদলে আমরা সমৃদ্ধিই আশা করতে পারি।

ব্রাহ্মণ বললেন, এই সাতটি শর্তের মধ্যে একটি মাত্র বর্তমান থাকলেই যদি ওদের সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত হয়, তাহলে সাতটিই বর্তমান থাকবার ফলে ওদের সমৃদ্ধি তো আরো বেশি সুনিশ্চিত হবার কথা। অতএব, গৌতম, মগধরাজের পক্ষে

ওদের পরাস্ত করা সম্ভব নয়—অর্থাৎ যুদ্ধে নয়, তার বদলে কূটনীতির সাহায্যে ওদের গণবন্ধন ছিন্ন না করলে নয়। তাহলে গৌতম, এবার আমরা বিদায় গ্রহণ করব, কেননা এখন আমাদের অনেক কাজ।

গৌতম বললেন, আপনারা যা ভালো বোঝেন।

ব্রাহ্মণ বর্ষকার বিদায় গ্রহণ করলেন।

ব্রাহ্মণ বিদায় নেবার পরেই তথাগত আনন্দকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আনন্দ, যাও, রাজগৃহর কাছাকাছি যত শ্রমণ আছে সকলকে চৈত্যাগৃহে সমবেত করো।

আনন্দ তাই করলেন।

তথাগত আসন ছেড়ে উঠলেন এবং চৈত্যাগৃহে প্রবেশ করে উপবেশন করলেন এবং শ্রমণদের উদ্দেশ্যে বললেন :

শ্রমণগণ, সজ্ঞার উন্নতি ও সমৃদ্ধির সাতটি শর্তের কথা আমি বলব...

এবং ব্রাহ্মণ বর্ষকারকে শোনাবার জন্য বুদ্ধ বজ্রি ট্রাইবদের উন্নতি ও সমৃদ্ধির মূলসূত্র হিসেবে যে-সাতটি শর্তের কথা বলেছিলেন, বৌদ্ধসজ্ঞার উন্নতির শর্ত হিসেবে তিনি আবার ঠিক সেই সাতটি শর্তের পুনরুচ্চারণ করলেন।

মহাপরিনির্বাণ-সূত্রের এই অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সজ্ঞা গড়বার সময়ে বুদ্ধর সামনে ঠিক কেন্ ধরনের আদর্শ ছিল, ঠিক কেন্ ধরনের সংগঠনকে তিনি সচেতনভাবে অনুকরণ করবার চেষ্টা করেছিলেন—তা এই রচনাটি থেকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা সম্ভব। কেবল এখানে একটি anachronism সম্বন্ধে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। বৌদ্ধগৃহে তথাগতর মহিমা বিশদভাবে দেখাবার আশায় তাঁর মুখে এই অসম্ভব দাবিটি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে যে তিনিই ওই ট্রাইব্যাল সমাজের মানুষগুলিকে গণবন্ধনের মহিমাটি বুঝিয়েছিলেন। এ দাবি স্পষ্টই অসম্ভব, কেননা ঐতিহাসিক ভাবে ট্রাইব্যাল সমাজ ও তার গণবন্ধনের গুরুত্ব বৌদ্ধধর্মের জন্মের চেয়ে অনেক বেশি পুরনো হতে বাধ্য। অতএব ধর্মগ্রন্থটিতে আমরা একটি বাস্তবেরই পরিচয় পাচ্ছি, কেবল সে-বাস্তব উদ্ভেদভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাহলে এই অংশের ইঙ্গিত ঠিক কী? বৌদ্ধধর্মের উদ্ভবের সময়ে ভারতের যে অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব হয়েছিল সেখানে তখনো অত্যন্ত শক্তিশালী ট্রাইব্যাল সমাজ টিকে ছিল এবং শক্তির মূলে ছিল ট্রাইব্যাল সমাজের গণবন্ধন। এবং একদিকে অজাতশত্রুর মতো উদীয়মান রাষ্ট্রশক্তির নায়ক যখন এই জাতীয়

দ্রাবিড় সমাজকে পরাজিত করতে বদ্ধমনস্থ হয়েছেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে বুদ্ধর স্বাধীনতা চাইছেন, অপরদিকে তখন স্বয়ং বুদ্ধ তাঁর সজ্ঞা গড়বার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত সংগঠনের দিকটুকুর জন্য এই ট্রাইব্যাল সমাজের গণজীবনকেই অত্যন্ত সচেতনভাবে অনুকরণ করবার চেষ্টা করছেন।

কৌটিল্যের রচনাত্তেও দেখা যায় তখনকার উদীয়মান রাষ্ট্রশক্তির একটি মূল উদ্দেশ্যই হল এ-জাতীয় ট্রাইব্যাল সমাজকে ধ্বংস করা। সে-কথা আমরা পরে উল্লেখ করব। তার আগে পূর্বপক্ষের একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়া প্রয়োজন : এই সংগঠনগুলি যে আসলে ট্রাইব্যাল সমাজ তার প্রমাণ কী? বুদ্ধত জয়সওয়াল প্রমুখ বিদ্বানেরা এগুলিকে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলেই ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। এই গুণিতটির খণ্ডন প্রসঙ্গেই আমরা শুরুতে যে-মুটি প্রশ্ন তুলেছিলাম তার প্রথমটির উত্তর দেওয়া হয়ে যাবে : গণতান্ত্রিক সংগঠন বলতে বুদ্ধর পক্ষে ঠিক কেন ধরনের সংগঠনের পরিচয় পাওয়া সম্ভবপর ছিল?

একর জন্ম হয়েছিল শক্য-গণে। তাঁর জীবদ্দশাতেই কোশলরাজ্যের আক্রমণে এই গণটি স্বাধীনতা হারায়। প্রশ্ন হল, গণ মানে কী?

রিস্ ডেভিড্‌স্‌ এখানে গণ কথাটির প্রতিশব্দ হিসেবে সরাসরি ট্রাইব (tribe) শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং পালি পুথিপত্র থেকে এই শাক্য-গণের যে-বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই মর্গান-বর্ণিত ইরোকোয়াদের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। ডক্টর গ্রিট এবং স্যার [রামকৃষ্ণ গোপাল] ভাণ্ডারকর-ও গণ শব্দকে ট্রাইব অর্থেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এফ্‌ জাব্লিউ টমাস এবং জয়সওয়াল গণ শব্দের এই অর্থের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং জয়সওয়াল দাবি করেন গণ শব্দের একমাত্র অর্থ হল প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

বর্তমানে আমরা শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে এই গণ-এর সাক্ষ্যগুলি সত্যিই দুর্মূল্য। বৌদ্ধসাহিত্য গণের কথার পরিপূর্ণ। গণ বলতে যদি ট্রাইব্যাল সংগঠন বা তার সুস্পষ্ট স্মারকই বুঝিয়ে থাকে এবং এ-সংগঠনের আদি অকৃত্রিম রূপটিকে যদি আদিম সাম্যসমাজ বলেই সনাক্ত করবার অবকাশ থাকে, তাহলে মানতে হবে বৌদ্ধ-ভারতের নানা জায়গায় এ-জাতীয় আদিম

সাম্যসমাজের গড়ন অবশিষ্ট ছিল। এবং বুদ্ধ স্বয়ং তারই সংগঠনকে আদর্শ হিসেবে মেনে নিজের সমস্ত গড়বার চেষ্টা করেছিলেন।

কথাটা খুব স্পষ্টভাবে বলা দরকার। ভুল বোঝবার আশঙ্কা আছে। আমরা নিশ্চয়ই একথা বলতে চাইছি না যে বৌদ্ধযুগে ভারতের অবস্থা আদিম সাম্যদশাই ছিল। তার বদলে আমরা অসমান উন্নতির নিয়ম (law of uneven development)-এর প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি।

বুদ্ধর আগে ভারতে রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব যে ঘটেনি তা নয়। বুদ্ধর প্রায় তিন হাজার বছর আগেই সিদ্ধ উপত্যকায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতবর্ষ বলতে এতটুকু জায়গা বোঝায় না এবং সারা ভারত জুড়ে সব মানুষেরই যে সমান তালে উন্নতি ঘটেছে একথাও মনে করবার কোনো কারণ নেই। এমনকি আজকের দিনেও ভারতবর্ষ থেকে ট্রাইব্যাল সমাজের চিহ্ন বিলুপ্ত হয়নি। বুদ্ধর যুগে ট্রাইব্যাল সমাজগুলির রূপ নিশ্চয়ই আরো অক্ষুণ্ণ ছিল, কেননা তখন বণিক, পাত্রি এবং আড়কাঠি প্রভৃতির দল এমনভাবে এগুলির মধ্যে প্রবেশ করতে শুরু করেনি।

সিদ্ধ উপত্যকা সম্বন্ধে যে-কথা সত্যি গঙ্গা উপত্যকা সম্বন্ধে তা সত্যি হতে বাধ্য নয়। কিন্তু তার মানে এও নয় যে বুদ্ধর সময়ে ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব ঘটেনি। “কয়েক শতাব্দী আগে থাকতেই গঙ্গা উপত্যকায় রাজশক্তির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে এবং যেন সারা ভারতের পক্ষেই রাষ্ট্রশক্তির অন্তর্ভুক্ত হবার সময় ঘনিয়ে আসছে।” একথা ঠিক। এবং একথাও ঠিকই যে জাতকের গল্পগুলি থেকে বৌদ্ধভারতেরই পণ্য উৎপাদনের রীতিমতো উন্নত পর্যায় এবং এমনকি মুদ্রা-প্রচলনের প্রমাণও পাওয়া যায়। এ-সবের আনুমানিক হিসেবে তখন নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনো রকম ক্রীতদাস-প্রথাও প্রচলিত থাকতে বাধ্য। জাতকের গল্পে সেই ক্রীতদাসদের বর্ণনার অভাব নেই।

এই দিককার কথাগুলি বর্তমানে বড়ো করে বলবার প্রয়োজন নেই। কেননা, ইতিপূর্বেই ফিক, রিস ডেভিড্‌স্‌ প্রমুখ বিদ্বানেরা বৌদ্ধভারতের এই দিকগুলির কথা অত্যন্ত বিস্তারিতভাবেই আলোচনা করেছেন। অপরপক্ষে যে-দিকটির কথা সাধারণত আলোচিত হয় না, — এবং যে-দিকটির কথা বাদ দিলে সামগ্রিক অর্থে বৌদ্ধ ভারতের চিত্র অনেকাংশেই অস্পষ্ট থাকতে বাধ্য, — বর্তমানে আমাদের পক্ষে বিশেষ করে তার আলোচনা তোলাই অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। সেদিকটির

কথা হল, তখনো ভারতের উত্তরপূর্ব অঞ্চলে নানা এলাকা জুড়ে আদিম সাম্যসমাজের চিহ্ন অক্ষুণ্ণ ছিল। এ বিষয়ে বিশ্বাসের অবকাশ নেই, কেননা অসমান উন্নতির নিয়মের দরুনই এইরকম।

এই দিকটির কথা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই জাতীয় সংগঠন থেকে বুদ্ধ ঐক্যাবে প্রেরণা পেয়েছিলেন তার কথা বাদ দিয়ে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের সংগঠন ও মতাদর্শ, কোনো বৈশিষ্ট্যই স্পষ্টভাবে বোঝবার উপায় নেই। আমরা দেখাবার চেষ্টা করব, আলি বৌদ্ধধর্মের যেটা প্রকৃত সাক্ষ্য আর যেটা প্রকৃত বিফলতা—৩৬য় বিষয়ই এই দিক থেকে বোঝবার অবকাশ আছে।

||৫||

বৌদ্ধ-ভারতের মানচিত্রটি মনে রাখা প্রয়োজন। হিমালয়ের কোলে ভারতের উত্তরপূর্ব অঞ্চল : তার দক্ষিণে কলিঙ্গ, উত্তরে কুরু ও পঞ্চাল; পূর্বে অঙ্গ, পশ্চিমে অবন্তী। প্রাচীন বৌদ্ধ-গ্রন্থে মোটের উপর এই এলাকাটির সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে।

আধুনিক মানচিত্রের বাঙলার পশ্চিমে, গঙ্গার দক্ষিণে, আধুনিক বিশ্বের যে-দক্ষিণাংশ তাই ছিল সেকালের মগধ। পালি ভাষায় তার রাজধানীর নাম রাজগৃহ, সংস্কৃত রাজগৃহ—আধুনিক রাজগিরি। প্রাচীন বৌদ্ধ-প্রভাবের প্রধানতম এলাকা বলতে এই মগধই। তার পূর্বে অঙ্গ, প্রধান নগরের নাম চম্পা। উত্তরে, গঙ্গার ওপারে বজ্জি, তাদের প্রধান নগরের নাম বেসালি, সংস্কৃতে বৈশালী। আরো উত্তরে মল্ল। মগধের পশ্চিমে কাশী, প্রধান নগরের নাম বারাগমী। কাশীর উত্তরে কোশল, রাজধানী শ্রাবস্তী। কোশলের উত্তরে শাক্য, পূর্বে কোলিয়।

ডক্টর ই. জে. টমাস মনে করিয়ে দিচ্ছেন, এই মগধ, অঙ্গ, বজ্জি, মল্ল, কাশী, কোশল, শাক্য ও কোলিয় নামগুলি মোটেই স্থানবাচক নয়। এগুলি আসলে ট্রাইব্যাল-বাচক। এবং এই ট্রাইব্যালগুলির মধ্যে তখন একমাত্র মগধ ও কোশলই ট্রাইব্যাল-সংগঠনের পর্যায় জেড়ে (দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী) রাষ্ট্রশক্তির রূপ গ্রহণ করেছিল। তৃতীয়ত, গুপ্তের জীবনের সঙ্গে প্রকৃত সম্পর্ক বলতে শুধুমাত্র উপরোক্ত তালিকার মানুষগুলিরই।

কথাগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ধৃত করা ভালো।

All these are tribal names, and it is misleading to use

the terms Anga, Magadha, etc., as if they were names of countries. In the sixth century B.C. the Magadhas and Kosalas had developed out of tribal organizations into two rival kingdoms, the Kasis being absorbed by the Kosalas, and the Angas by the Magadhas. These are all the peoples that have any claim to be connected with the scenes of events in Buddha's life.

যদি তাই হয়, তাহলে এই পটভূমি সম্বন্ধে সম্যকভাবে সচেতন না হলে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত রূপটিকে নিশ্চয়ই চেনা যাবে না। কিন্তু সচেতন হতে হলে কয়েকটি মূল প্রশ্নকে অগ্রাহ্য করা অসম্ভব।

বৌদ্ধ-ভারতে শুধুমাত্র মগধ ও কোশল ছাড়া সবই যদি ট্রাইব্যাল-সমাজ হয় তাহলে প্রথম প্রশ্ন তোলা দরকার, ট্রাইব্যাল-সংগঠনের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য কী? মগধ ও কোশল তখন যদি ট্রাইব্যাল-সমাজ পিছনে ফেলে তবে রাষ্ট্রশক্তির রূপ গ্রহণ করে থাকে তাহলে দ্বিতীয় প্রশ্ন তোলা দরকার, ট্রাইব্যাল-সংগঠনের সঙ্গে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রভেদ ঠিক কী এবং কীভাবেই বা ট্রাইব্যাল-সমাজের ধ্বংসস্থূপের উপর রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব হয়? তৃতীয়ত, আশেপাশের ওই যে-ট্রাইব্যালগুলির তখনো ট্রাইব্যাল-অবস্থা অক্ষুণ্ণ ছিল সেগুলির প্রতি উদীয়মান রাষ্ট্রনায়কদের মনোভাবটা কী রকম, এবং গৌতম বুদ্ধের মনোভাবটাই বা কী রকম ছিল।

দুঃখের বিষয় ডক্টর টমাস—তথা রিস্ ডেভিড্‌স্, ওল্ডেনবার্গ, ফিক্ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধশাস্ত্রবিদরাও—এই প্রশ্নগুলিকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করেছেন। ফলে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত ভূমিকা আজো আমাদের কাছে অনেকাংশে অস্পষ্ট হয়ে থেকেছে।

ট্রাইব্যাল-সমাজ মানে কী? — এ প্রশ্ন বাদ দিয়ে নিশ্চয়ই প্রাচীন ট্রাইব্যালগুলির কথা আলোচনা করা যায় না। এবং প্রশ্নটিকে একবার স্বীকার করলে আর অস্বীকার করা যায় না হেনরি লুইস মর্গানের আবিষ্কার। কিন্তু সে-আবিষ্কার স্বীকার করতে হলে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, রাষ্ট্রশক্তি প্রভৃতির সনাতনত্ব অস্বীকার করা প্রয়োজন। অথচ, এগুলিই হল আধুনিক সমাজের ভিত। ফলে, এই আধুনিক সমাজেরই এক অংশে—আধুনিক বিজ্ঞানসমাজে মর্গানের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ।

এই কারণে প্রাচীন ইতিহাসের অনেক অধ্যায়ই আজো আমাদের কাছে প্রকৃতপক্ষে অজানা।

১৩।

পূর্ব ট্রাইব্যাল-সমাজে ভাজন ধরবার আগে পর্বত আদিম সাম্যাবস্থা। উৎপাদন-শক্তির উন্নতির ফলে সেই সাম্যাবস্থা ভেঙে যায় এবং তারই ধ্বংসস্থূপের উপর রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব হয়। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ বিশ্লেষণে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা ঠাণ্ডাসের এই সাধারণ নিয়মটি সম্বন্ধে উদাসীন হলেও বৌদ্ধ-গ্রন্থ-লেখকেরা তা ভুলেন না। বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব প্রাচীন কালের ঘটনা বলেই প্রাচীন পৃথিবীর এই গুণপরিবর্তনের স্মৃতিটি হয়তো বৌদ্ধ-ঐতিহ্যে অনেকখানি অক্ষুণ্ণ ছিল। মগধসমাজে পথ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাবল্লভ-অবদান থেকে রাজশক্তির উদয়-সংক্রান্ত নিম্নোক্ত কাহিনীটি উদ্ধার করেছেন, পৌরাণিক চিন্তার সংমিশ্রণ সত্ত্বেও এ-কাহিনীর মূলে ওই ঐতিহাসিক বিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়।

“যখন সৃষ্টি হয়, লোকের থাকিবার স্থান হয়, কতকগুলি ‘সত্ত্ব’ আভ্যন্তরীণ হইতে নামিয়া পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়। ... তাহাদের আহার প্রীতি এবং বাড়িঘর সুখ। সুখনিবাসে থাকিয়া তাহারা প্রীতি ভক্ষণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন। তাহারা গাধা করেন সবই ধর্ম।

“তাহার পর পৃথিবী উদয় হইল—যেন একটি হ্রদ, জলে পরিপূর্ণ। ... পৃথিবীর এস খাইতে খাইতে তাহাদের রক্ত-ও সেইমত হইয়া গেল। এইরূপে অনেকদিন যায়। যাহারা অধিক আহার করেন তাহাদের রক্ত খারাপ হইয়া উঠে, আর যাহারা অল্প আহার করেন তাহাদের রক্ত ভাল থাকে। ভাল রক্তের লোকে মন্দ রক্তের লোককে অবজ্ঞা করে। সুতরাং আমি বড় ভূমি ছোট এই মান-অভিমান জাগিয়া উঠিল। একদিন যে-ধর্ম তাহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল, অভিমানের উদয়ে তাহাদের সে-ধর্মের প্রভাব খর্ব হইয়া গেল। পৃথিবী হইতে সে রসও লোপ পাইয়া গেল। তখন তাহারা খন কি? পৃথিবীর সর্বত্র ভূইপটপটি উঠিল... ক্রমে তাহারা ভূইপটপটি খাইতে লাগিলেন। ভূইপটপটির মত তাহাদের রক্ত হইল। এইরূপে কত কল-কলান্তর কাটিয়া গেল। ... ভূইপটপটির লোপ হইল, তাহারা জায়গায় কলতা জন্মাইল। লোকে তাহাই আহার করিতে লাগিলেন। তাহাদের রক্ত কলতার মতই

হইয়া গেল। ক্রমে কলতার বেলায়ও মান-অভিমান আসিয়া জুটিল, কলতারও লোপ হইল। এবার আসিলেন শালিধান। এ-ধানের কথা নাই, তুষ নাই, অতি সুগন্ধ।... এই ধান খাইয়া লোকে কতকাল রহিল। প্রথম প্রথম সকলেই সকল-সম্মা দুইবেলা ধান খাড়িয়া আনিত... সঞ্চয়ের নামটিও করিত না। কিন্তু ক্রমে দু-একজন ভাবিল, দুইবেলায়ই ধান কাটিতে হইবে কেন? এক-বেলাতেই দুইবেলার ধান ঘোগাড় করিয়া আনি। তাহারা তাহাই করিতে লাগিল। তাহাদের দেখা দেখি অনেকেই সেইরূপ করিতে লাগিল। বরঞ্চ সঞ্চয়ের মাত্রা বাড়িয়া গেল। এখন আর দুইবেলার সঞ্চয়ে কুলায় না, দুই দিনের সঞ্চয়ই হইতে লাগিল, ক্রমে দুই সপ্তাহেরও সঞ্চয় হইতে লাগিল।... অন্নরসের সঙ্গে সঙ্গে আর এক উৎপাত আসিয়া জুটিল। কতকগুলি জীবের শরীরে পুরুষের চিহ্ন দেখা দিল, কতকগুলি জীবের স্ত্রী-চিহ্ন দেখা দিল। তাহারা আবার পরস্পরের প্রতি অনুরাগ দেখাইতে লাগিল।... ক্রমে দোষ উৎপন্ন হইল।... ক্রমে ক্রমে অনেক দিন পর এ-দোষ সহিয়া গেল। লোকে মনে করিল, ইহা ধর্মসম্মত, সমাজসম্মত, সহবাসসম্মত। লোকেও প্রথমে ভয়ে ভয়ে একদিন, দুইদিন একত্র বাস করিত। এখন মাস, পক্ষ, সংবৎসর, একত্রে বাস করিতে লাগিল। গৃহকর্ম সকলও স্ত্রীলোকদিগকে করাইতে লাগিল। ক্রমে অর্থমের কথা চাপা পড়িয়া গেল।

“ওদিকে কণাওয়াল, তুষওয়াল ধান ক্ষেত না করিলে আর জন্মায় না। কতকগুলি দুই লোকে অন্যায় করিয়া সঞ্চয় করিতে গিয়া আমাদের এমন সুখের খোরাকে ছই দিল। যাহা হউক, এখন আমাদের এক কাজ করিতে হইবে। এখন ক্ষেত ভাগ করিতে হইবে, সীমাসরহদ বাঁধিয়া দিতে হইবে—এই ক্ষেত তোমার, এই ক্ষেত আমার, এই ক্ষেত রামের, এই ক্ষেত শ্যামের। এইরূপ আবার কিছুদিন চলিল।

“একজন বসিয়া ভাবিতে লাগিল : আমার ত এই ক্ষেত, এই ধান। যদি কম

* কেননা, মর্যাদার সিদ্ধান্তটা হল : A mere property career is not the final destiny of mankind, if progress is to be the law of the future as it has been of the past. The time which has passed away since civilization began is but a fragment of the past duration of man's existence; and but a fragment of the ages yet to come. The dissolution of society bids fair to become the termination of a career of which property is the end and aim; because such a career contains the elements of self-destruction.

অন্যায়, কী করিয়া চলিবে? সে মনে মনে ঠাহরাইল, দিক আর না দিক, অন্যের ধান আমি তুলিয়া লইব। সে আপনার ধানগুলি সঞ্চয় করিয়া অপরের ক্ষেতের ধানগুলি উঠাইয়া আনিল। তৃতীয় ব্যক্তি দেখিতে পাইয়া কহিল, ‘তুমি কর কি? না-এ ধান তাহাকে না বলিয়া তুলিয়া আনিল। তৃতীয় ব্যক্তি দেখিতে পাইয়া খাপা খাপা বলিল, ‘তুমি ফের এই কাজ করিলে?’ সে বলিল, ‘আর এরূপ হইবে না।’ কিন্তু কিছুদিন পরে সে আবার পরের ধান উঠাইয়া আনিল। তৃতীয় ব্যক্তি এবার খাপা চূপ করিয়া রহিল না। সে তাহাকে বেশ উত্তম-মধ্যম দিয়া দিল। তখন ধানচোর হাত তুলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল, — ‘দেখ ভাই আমাকে মারিতেছে, দেখ ভাই আমাকে মারিতেছে। কী অন্যায়, কী অন্যায়।’ এইভাবে পৃথিবীতে চুরি, মদ্য কণা ও অশান্তির প্রাদুর্ভাব হইল।

“তখন সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল, — আইস, আমরা একজন পণ্ডিত, বুদ্ধিমান, সকলের মন যোগাইয়া চলে, এমন লোককে আমাদের ক্ষেত বাঁধবার জন্য নিযুক্ত করি। তাহাকে আমরা সকলে ফসলের অংশ দিব। সে ফসলের দশ দিবে, ভাল লোককে রক্ষা করিবে, আর আমাদের ভাগমত ফসল দেওয়াইয়া দিবে। তাহারা একজন লোক বাছিয়া লইল। সকলের সম্মতিক্রমে সে গাধা হইল, এইজন্য তাহার নাম হইল মহাসম্মত। এইরূপে তেজোময় জীব অনন্ত থাকার চুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ক্রমে লোভে মাটিতে পড়িয়া মাটি হইয়া গেল। শেষে তাহাদের ক্ষেত আগলাইবার জন্য একজন ক্ষেতওয়ালার দরকার হইল। সেই ক্ষেতওয়ালাই রাজা, ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ তাহার মাহিলা।”

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে মহাবল্লভ-অবদানের এই অংশটির তুলনা নেই। এ কথা ঐতিপূর্বে দাবি করা হয়েছে, মহাভারতের শান্তিপর্বৎ এই স্মৃতির পরিচয় পাওয়া যায় যে প্রাক-বিভক্ত সাম্য-সমাজের ধ্বংসের উপরই রাজশক্তির বা রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব ঘটেছিল, সে কথা ঠিক। তবুও মহাবল্লভ-অবদানের কাহিনীটির বৈশিষ্ট্য হল এর মধ্যে অধ্যাত্মবাদের লেশমাত্র চিহ্ন নেই, বরং দৃষ্টান্তটি বস্তুবাদী—সে বস্তুবাদ যত প্রাকৃত ও স্থূল হোক না কেন। কেননা, এই উপাখ্যান অনুসারে কৃষিকাজ, ক্ষেত-ভাগ, ব্যক্তিগত সঞ্চয় প্রভৃতিকেই প্রাক-বিভক্ত সমাজের ধ্বংস-কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এমনকি স্বাভাবিক সাহায্যেই বর্ণবৈষম্যের ব্যাখ্যা খোঁজা হয়েছে। সেই সঙ্গে স্ত্রী-পুরুষের পারিবারিক জীবনের

উৎপত্তি-সংক্রান্ত যে আভাস পাওয়া যাচ্ছে তাও উপেক্ষণীয় নয়।

অপর পক্ষে, মহাভারতাদির কাহিনী অধ্যাত্মবাদ-প্রসূত। রাজা সেখানে ঈশ্বরের প্রতিনিধি। এবং মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যেমন দেখাচ্ছেন, একমাত্র বৌদ্ধ ঐতিহ্যই রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে স্বীকার করতে সম্মত হয়নি।

“এখানে আর একটি কথা বলা আবশ্যিক। রাজার উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা দেশে নানা মত চলিতেছে। রাজা যে ঈশ্বরের অংশ—এই মতটি অধিক দেশে চলিত। রাজা যে প্রজার চাকর এ কথা অনেকেই বলিতে সাহস করে না। কিন্তু বৌদ্ধদের মধ্যে এই মত অনেক দিন চলিয়াছিল। চন্দ্রকীর্তি খ্রীঃ পঞ্চম শতকে বলিয়াছেন :

গণদাসস তে গর্বাযেড্ভাগেন ভূতস্য কঃ।

—তুমি ত দেশের লোকের দাস। ফসলের ছাড়াগের একভাগ মাহিনাই তোমার জীবিকা। তুমি আবার গুমর কর কি?”

গৌতম-বুদ্ধও কোনোদিন রাজশক্তির প্রতি খুব বড়ো একটা সম্মান দেখাননি। অজাতশত্রুর মন্ত্রী ব্রাহ্মণ বর্ষকার বজ্রির বিরুদ্ধে রাজ অভিযানের জন্য গৌতমের আশীর্বাদ তিচ্ছা করতে এসে ফিরে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে যাবার পর ভিক্ষুদের ডাক দিয়ে গৌতম বলেছিলেন, বজ্রির ওই গণসমাজের বা ট্রাইব্যাল-সমাজের গণবন্ধনটিকে সার্থকভাবে অনুকরণ করবার উপরই বৌদ্ধ-সজ্ঞাগুলির সমৃদ্ধি নির্ভরশীল।

□

চয়ন—পরিচয় - ১৯৭৬

প্যারীচাঁদ মিত্র : বাঙলা গদ্যে ও কথাসাহিত্যে নতুন মাত্রা

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

একজন সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকরিতা হেতু বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শীইল, দুর্গল, এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিয়া টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষয়বস্তুর মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি ইংরেজিতে সুশিক্ষিত ইংরেজিতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখায়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতে বা কেন গলাগাছ রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথাপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় ‘আল্‌লালের ঘরের দুলাল’ প্রণয়ন করিলেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেই দিন হইতে শুদ্ধ ভাষার মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল। (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ‘বাঙ্গালা ভাষা’, বিবিধ প্রবন্ধ। বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ, প্রবন্ধ বস্তু প্রথম অংশ, সাফল্যতা প্রকাশন, ১৯৭৩ পৃ: ৪৭৮)

এই কথাগুলির মধ্যে কিছু অত্যাতি আছে; লুপ্তরস্বোদ্ধার-এর ভূমিকায় বঙ্কিম পূর্বে সেটি শুধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু মূলে ভুল নেই। বাঙলার কথাসাহিত্যিকরা জানেন না টেকচাঁদ ঠাকুরের কাছে তাঁরা কতখানি ক্ষণী। সাধারণভাবে বাঙলার গদ্যলেখকদের সম্পর্কেও কথাটা সমান সত্য। হতোমের আগেই টেকচাঁদ মাঝারি ও নিচু রীতিতে বাঙলা লেখায় অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের কথিত ভাষায় বহু বৈচিত্র্য থাকে। ছোটোবেলা থেকেই উত্তর কলকাতায় মানুষ হওয়া সত্ত্বেও প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩) কীভাবে হিন্দু ও মুসলমান, স্ত্রী ও পুরুষ, বালক ও বৃদ্ধর ভাষা অত নিপুণভাবে আয়ত্ত করতে পারলেন তা ভাবতে অবাক লাগে। আর সংলাপের মতোই তাঁর পবিত্রের ভাষাও সমান স্বচ্ছন্দ, সমান বৈচিত্র্যময়। বাঙলা গদ্যের গড়ে-ওঠার পূর্বে, অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগরের পাশাপাশি, সম্পূর্ণ অন্য চালের ভাষা লিখে গেছেন প্যারীচাঁদ মিত্র। শুধু আল্‌লালের ঘরের দুলাল-এ নয়, মদ খাওয়া বড়ো দায় ইত্যাদি রচনাতেও প্যারীচাঁদের ভাষা চোখে পড়ার মতো জীবন্ত; তাঁর

চরিত্রেরা সুখে দুখে তাদের স্বভাব অনুযায়ী নিজের ভাষায় মনের কথা বলে, পরিস্থিতির মোকাবেলা করে—এ বড় কম গৌরবের কথা নয়। আলালি গদ্য বা আলালি ভাষা সবদিক থেকেই অন্য সকলের থেকে আলাদা। এ বিষয়ে শিবনাথ শাস্ত্রীর মন্তব্য মনে করার মতো : ‘এই আলালী ভাষার সৃষ্টি হইতে বঙ্গসাহিত্যের গতি ফিরিয়া গেল। ভাষা সম্পূর্ণ আলালী রহিল না বটে কিন্তু ইশ্বরচন্দ্রী রহিল না, বঙ্কিমী হইয়া দাঁড়াইল। এজন্য আমার পূজ্যপাদ মাতুল, সোমপ্রকাশ সম্পাদক, খ্যাতনামা ধারকানাথ বিদ্যাহুযণ মহাশয় সোমপ্রকাশে কতই শোক করিলেন। কিন্তু আমার বোধ হয় ভালই হইয়াছে জীবন্ত মানুষ ও ভাষা যত কাছাকাছি থাকে ততই ভাল’ (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, নিউ এজ, ১৯৮৩, পৃ. ১৩১)। আরও এক পা এগিয়ে প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন : ‘... বাঙ্গালির ওড়ানো বিদ্রোহের দুটি লাল পতাকা আজও আমাদের সাহিত্যগগনে জ্বলজ্বল করছে। আলালের ঘরের দুলাল আর হতোম পাঁচার নকশা যে বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর এনেছিল তার সাক্ষী স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র’ (প্রবন্ধসংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৫৭, পৃ. ৩৩২)।

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াই-এ ভাষার লড়াইও একটি প্রধান রণাঙ্গন : যে কোনো জাতিসত্তার মুখের ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখা ও আরও বিকশিত করা সেই লড়াই-এর একটি প্রধান অঙ্গ। এই লড়াই-এ প্যারীচাঁদ মিত্র ছিলেন প্রধান সেনাপতি। একটু অন্যভাবে বঙ্কিমচন্দ্র এই দিকটির কথাই বলেছিলেন : ‘তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে, — তাহুর জন্য ইরাজী ও সংস্কৃতর কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে, তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি “আলালের ঘরের দুলাল” (লুপ্তরস্নোদ্ধার-এর ভূমিকা, ‘বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান’, বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, ১৯৫৭)।

১৮৬৯ অর্থে উপন্যাস শব্দটি প্যারীচাঁদই প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। তিনিই যে প্রথম বাঙলা উপন্যাস লিখছেন এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতনও ছিলেন তিনি (শ্রীলাল এর ইংরিজি প্রিফেস ও বাঙলা ভূমিকা দ্র.)। আইভানহো (১৮১৯)-র যেমন গল্প না থামিয়েই নরমান বিজয় (১৮৬৬)-এর আগের ইল্যান্ড ও তার ভাষা ইতিহাস বর্ণনা করেন (পরিচ্ছেদ ১) ওয়াল্টার স্কট (১৭৭১-১৮৩২) যেমন প্যারীর নোতর দাম (১৮৩১, ইংরিজি অনুবাদে যার নাম হয়ে গেছে দামোদর অফ নোতর দাম)-এ বিরাট এক অধ্যায় জুড়ে ভিক্টর উগো (১৮৯২-১৮৮৫) লিখে চলেন প্যারী শহরের ইতিহাস (তৃতীয় ভাগ দ্বিতীয় অধ্যায়), প্যারীচাঁদও তেমনি আলাল-এ নথিবন্ধ করে রাখেন কলকাতা তথা বাঙলায় ইংলিশ শিক্ষার ইতিবৃত্ত আর কোম্পানির আমলের নতুন বিচারবিধি। উপন্যাসের মধ্যে এই ব্যাপারগুলি কিন্তু স্বাভাবিকভাবে আসে, গল্পই অঙ্গ হিসেবে।

কথাসাহিত্যিক প্যারীচাঁদের কীর্তি আলাল-এই সীমাবদ্ধ নয়। বাঙলা মুখচলিত গল্পকে মদ্যপান নিবারণ আন্দোলনের কাজে লাগিয়েছিলেন তিনি। মদ খাওয়া বন্ধ দায় জাত থাকার কি উপায় (১৮৫৯)-এর গল্পগুলি বাঙলা ছোটগল্পের গুণনা। দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯-১৮৭৩)-র সধবার একাদশী (১৮৬৬)-র মতো এই ধরনের শিক্ষামূলক। কিন্তু তার জন্যে এর বিনোদন-মূল্য এতটুকু কমে না। লেখক হিসেবে প্যারীচাঁদ সর্বদাই উদ্দেশ্যপ্রবণ, নিছক আমাদের জন্যে তিনি লেখেনও লেখেননি। পাক্কা কলকাতাইয়া হয়েও তিনি লিখেছিলেন কৃষিপাঠ (১৮৬১)। তাতে আছে সেগুন গাছ রোপনের প্রণালী, কুসুম ফুলের চাষ এবং গ্রাম্যার্থে বড়ি প্রস্তুত করিবার প্রণালী ইত্যাদি। নিজের হাতে চাষ করার খাতিরত তাঁর ছিল না, কিন্তু নানা সূত্রে খবর জোগাড় করে ‘আরোক্ষট, গৈলপওকা, আকন্দ, তামাকু’, অবশেষে খেজুর গাছ চাষের পদ্ধতি নিয়ে তিনি লিখেছেন একেবারে মাটির ভাষায়। বিশুদ্ধ সাহিত্যবিলাসীরা এই বইটির কথা বলেন না। কিন্তু কৃষিপাঠ প্যারীচাঁদের অন্যতম কীর্তি।

সম্পূর্ণ অন্য একটি প্রসঙ্গ দিয়ে আলোচনা শেষ করি। বাঙলা সাহিত্য,

অজস্র সমস্যা কষ্টকিত এই বক্তব্য সম্পর্কে দুই একটি কথা না বললেই নয়।

প্রথমত, সকল সভ্য সমাজে চতুর্ভূষ ছিল তার প্রমাণ কোথায়? প্রাচীন মেসোপটেমিয়া, অসেরিয়া, ব্যাবিলনীয়, সিদ্ধ, গ্রীস বা রোমে এরকম বিভাজন পাওয়া যায় না। একমাত্র ভারতে বৈদিক-আর্যদের মধ্যেই এ ধরনের বর্ণ বিভাজন ছিল। অর্থাৎ বিবেকানন্দের এই তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক ও মনগড়া।

দ্বিতীয়ত, প্রথমে ব্রাহ্মণ, তারপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র (একের পর এক) পৃথিবীতে আধিপত্য স্থাপন করে—এ ধারণা কোন ইতিহাসে পাওয়া যায়? পৃথিবীর কোনো দেশে, এমনকি ভারতবর্ষেও এমন প্রমাণ মেলে না। প্রাচীন মেসোপটেমিয়া, মিশর, ইনকা সভ্যতাকে রাজা ছিলেন একাধারে রাজনৈতিক শাসক ও ধর্মীয় প্রধান। মুসলিম সভ্যতার ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক শাসক ও ধর্মীয় নেতার মধ্যে কোনও বিভাজন ছিল না। আবার যে ভারতবর্ষে বর্ণ ব্যবস্থার এত আধিপত্য, সেখানেও ব্রাহ্মণ শাসনের যুগ বা ক্ষত্রিয় শাসনের যুগ বা বৈশ্য শাসনের মধ্যে কোনও পার্থক্য করা যায় কি? বরং আর্য-বৈদিক যুগকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মধ্যেকার, বিরোধ ও আপোষের যুগ বলে চিহ্নিত করাই যথাযথ। এর সাথে আর যা যোগ করা উচিত তা হল আর্য-প্রাগার্য সংঘাত ও সমন্বয়। অর্থাৎ ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ ধারাটি একেবারেই সরলরৈখিক নয়, তা জটিল ও বহু পরস্পর বিরোধী ঘটনা প্রবাহের টানাপোড়েনের ফল। ফলে বিবেকানন্দের এই বর্ণতত্ত্বের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসকে দেখা যে একেবারেই ঐতিহাসিক তা যেমন বলার অপেক্ষা রাখে না। তেমনি ভারতে বর্ণ ব্যবস্থা থাকে সত্ত্বেও তাঁর তত্ত্বের অতিসরলীকরণ সমাজ বিকাশের প্রক্রিয়াটি বোঝার ক্ষেত্রে একেবারেই সহায়ক নয়।

'বর্তমান ভারত'-এর কোনও কোনও অংশ এতই অস্পষ্ট যে তার থেকে কোনও অর্থ উদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব। বিবেকানন্দ লিখেছেন :

"বৌদ্ধ বিপ্লবের পর ব্রাহ্মণ্যশক্তির বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে রাজশক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ আমরা দেখিযাছি। বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের বিনাশ ও মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপন—এই দুই কালের মধ্যে রাজপুত জাতির দ্বারা রাজশক্তির পুনরুত্থানের চেষ্টা যে বিফল হইয়াছিল, তাহারও কারণ পৌরোহিত্য শক্তির

নবজীবন চেষ্টা।" (২০১১:৬:১৭৭)।

বৌদ্ধ বিপ্লবের সময়কাল যদি খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক হয়, তার পরে 'ব্রাহ্মণ্য শক্তির' মোটেই 'বিনাশ' ঘটেনি। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে, কখনো আঞ্চলিক স্তরে কখনও সাম্রাজ্যিক স্তরে ব্রাহ্মণেরা তাদের জোরালো অস্তিত্ব বরাবর বজায় রাখতে পেরেছে। 'বৌদ্ধ সাম্রাজ্য'-র বিনাশ ও মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপনের মধ্যেকার কাল গত দূরত্ব কতটা ছিল — তা কি বিবেকানন্দ জানতেন? বৌদ্ধ সাম্রাজ্যইবা কি জিনিস? এই দুই কালের মধ্যে রাজপুত জাতির পুনরুত্থানের অর্থ কি ক্ষত্রিয় শক্তির উত্থান? রাজপুত জাতির পুনরুত্থানের ব্যর্থতার কারণ পৌরোহিত্য শক্তি (ব্রাহ্মণ্য শক্তি)-র নবজীবনের চেষ্টা—এই সিদ্ধান্তের পিছনে বিবেকানন্দ কোনরকম ঐতিহাসিক সাক্ষ-প্রমাণ, উদাহরণ ইত্যাদির ধার ধারেননি।

প্রাচীন ভারতের কালপঞ্জীর দিকে যদি নজর দেওয়া যায় তাহলে টের পাওয়া যাবে বিবেকানন্দের ইতিহাস তত্ত্বটি কতটা ভিত্তিহীন, কতটা হাস্যকর।

খ্রিস্ট পূর্বাব্দ

৩০০০-১৫০০	—	সিদ্ধুসভ্যতা। এখানে শ্রেণীভেদ থাকলেও বর্ণভেদ ছিল না।
১৫০০-১০০০	—	আর্য-বৈদিক পর্ব। বর্ণভেদের আবির্ভাব। এটি ছিল নমনীয় ব্যবস্থা।
১০০০-৬০০	—	পরবর্তী বৈদিক যুগ। বৈদিক আর্যদের বসতি বিস্তার। কঠোর বর্ণভেদের আবির্ভাব।
৬০০	—	দ্বিতীয় নগরায়ন।
৫৬৬-৪৮৬	—	বুদ্ধের আবির্ভাব ও মৃত্যু।
৫৪৪	—	বিশ্বাস্যের সিংহাসনে আরোহণ ও মগধের উত্থান।
৪৩০	—	শিশুনাগের সিংহাসন লাভ। এরা ছিলেন শূদ্র।
৩২৪	—	মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। এরাও ছিলেন শূদ্র।

বিবেকানন্দের 'শূদ্র-জাগরণ' বা একটি আখ্যাত গল্প

- ৩১৭ — ভারতে ম্যাসিডেনীয় শাসনের অবসান।
- ৩০০-২৭৩ — বিন্দুসারের শাসন। শূদ্র শাসন।
- ২৭৩-২৩২ — অশোকের শাসন। শূদ্র শাসন।
- ১৮৭ — মৌর্য বংশের শেষ রাজা বৃহদ্রথকে হত্যা করেন তারই ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র গুপ্ত। গুরু হয় গুপ্ত যুগ / ব্রাহ্মণ শাসন।
- ৭৫ — গুপ্ত রাজ দেবভূতিকে ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বসুদেবের প্ররোচনায় এক দাসী কন্যা হত্যা করে। বসুদেবের সাহায্যে গুরু হয় কাষ্য রাজবংশের শাসন। কাষ্যরা ছিলেন 'গুপ্ত ভূতা' অর্থাৎ শূদ্র। এখানে ব্রাহ্মণ ও শূত্রের মধ্যকার মৈত্রীই দেখতে পাওয়া যাবে, যেমন দেখা গিয়েছিল ব্রাহ্মণ চানক্য ও শূত্র রাজা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মধ্যে।

খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় ও
শেষ শতক

- গুপ্ত ও কাষ্যবংশীয় রাজারা যখন ভারতের অভ্যন্তরে শাসন চালাচ্ছিলেন, তখন উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ব্যাকট্রীয়



গুপ্ত শাসন

কবিক চৌধুরী

নিজেদের ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দিতে শুরু করে। কিন্তু রক্ষণশীল সমাজ তাদের ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বলে স্বীকার করে নেয়নি। ২২৫ খ্রিস্টাব্দে সাতবাহন বংশের অবসান ঘটে।

খ্রিস্টাব্দ

১৫ - প্রায় ৩২০

— উত্তর-পশ্চিম ভারতে কুষাণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যা কালক্রমে উত্তর ও পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এরা মূলত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন, কয়েকজন শিব ভক্ত ছিলেন।

চতুর্থ শতাব্দী

— উত্তর ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের আবির্ভাব। পরবর্তীকালে পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব ভারতে প্রসারিত হয়। এরা সম্ভবত ব্রাহ্মণ বা বৈশ্য ছিলেন।

ষষ্ঠ শতাব্দী

— গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হয়।

'বর্তমান ভারত'-এ বিবেকানন্দ বলেছিলেন :

"চীন, সুমের, বাবিল, মিসর, খলদে, আর্য, ইরানী, ইন্দী, আরব—এই সমস্ত জাতির মাধ্যমে সমাজ-নেতৃত্ব প্রথম যুগে

সমাজে সঞ্চারিত হইয়াছে। হিব্রীজ, ফার্স, ক্ষত্রিয়কলা অর্থাৎ

কোনো কোনো মতে, ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্ট, ইত্যাদি ধর্মের মূল

বৃত্তি হইত ব্যাঙের মতো তিনে বিভাজিত। তেমন করে, তেমন ছিল সাম্রাজ্য

না। সাম্রাজ্য চলে কম ও খিয়ে পড়ে যেতে যেতে বলতে থাকে আমাদের

সমাজে। সাম্রাজ্যের মূল ভিত্তি—

ভারত ভিত্তি হইতে দ্বিবিভক্ত হয়ে ফেলেন। বৃত্তি তার দু'ধাতের মধ্যে একিয়ে

পড়ে। মুখে তার সেনা, চোখ দুটো উজালেন। ভারত সার্বভৌম করে ওঠে—

মহা! মহা!

ভারতের দ্বিবিভক্ত আর কোনদিন আরো কাছে আসার কল্পনা—আমাদের

সেইসময় নিয়ে চল না, সিন্দুরকা বুলব। ইয়া পর্যন্ত সব ঠিক আছে তো?

সম্রাজ্যের মূল ভিত্তি—

নেশা খরিয়ে দিল

বিকল। তাই প্রত্যাশিক

যবক হয় আমার বুন হয়ে

বাসস্থান। নৌকা, জাল ও খোরাকির টাকা, আড়তদারের কাছ থেকে নির্দিষ্ট শর্তের বিনিময়ে যেমন ধার নিতে হয়? তেমনি সমুদ্রের এই উন্মুক্ত চরে কয়েকটা মাস থাকার জন্য প্রশাসনিক অলিখিত ফতোয়ায়, তোলা তুলতে আসে চাটি পায়ে, গেঞ্জি গায়ের পুলিশ। এছাড়াও দেখা যায়, মস্তান ও মেয়ে-পাচারকারীর দালালদেরও। প্রকৃতির একান্ত এ-প্রান্তে, এছাড়াও ছিল নানান উৎপাত। সাপ, কড়-জল ছাড়াও ভয় ও ভাবনার অনেক উপকরণ ছিল। পথ চলাতে চলাতেই বিকাশ তার সহজাত অভিজ্ঞতার কথা আমাকে শোনায়।

চারপাশটা অস্বাভাবিক গুনশান। বিক্ষিপ্ত দু-একজন মানুষ এদিক ওদিক চোখে পড়লো। অনবরত সমুদ্রের হুকুর আর গাঙচিলের চিৎকার, পরিবেশটাকে ধমকুতে করে রেখেছে। তড়িঘড়ি বিকাশ নুয়ে পড়া একটা চালার মধ্যে ঢুকে গেল। আমি সেখানেই ধমকে দাঁড়িয়ে পড়ি। দাঁড়িয়ে থাকি বিকাশের অপেক্ষায়। বাঁশে দুলকি চালে ফুলিয়ে দুটো লোক, কাঁধে করে জাল নিয়ে নদীর গা ধরে হেঁটে চলেছে। 'কই আয়!' বিকাশ চালা থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে ডাকলো। আমি হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। 'কি ভাবছিস! ভেতরে আয়!' বিকাশ আমাকে ডেকে আবার ভেতরে চলে গেল।

বুঝলাম, চালার মধ্যে ঢুকতে গেলে, মাথাটাকে মাটির কাছাকাছি নামিয়ে আনতে হবে। আমিও ঝিখা-স্বন্দ্র বেড়ে ফেলে, গর মতই ভেতরে ঢুকে গেলাম। 'ওঃ!' এক অসম্ভব তীব্র উৎকট গন্ধে দম বন্ধ হয়ে গেল। মুহূর্তের জন্য হলেও আমি নাকটা হাতের তালুতে চেপে ধরি। কিন্তু তা কতক্ষণ! তারপর স্বাভাবিক নিয়মেই হার মনতে হলো বাস্তবতার কাছে। দেখলাম দিনের বেলাতেও এ ঘরের মধ্যে হাঙ্কা আলো-আঁধারির আধিপত্য। তবে মনে হলো, গন্ধটা পুরো ঘরটাকেই গিলে নিয়েছে।

আমার অস্বাভাবিক মুখভঙ্গি দেখে বিকাশ দাঁত বার করে, হেসে উঠল। 'দেখিস, কন্টাকে ধরে রাখিস। ওটা বেরিয়ে গেলে কিন্তু ধরা মুশকিল হয়ে যাবে।' মুহূর্তের মধ্যে হাতটা নাক থেকে সরিয়ে নিই এবং ওকে স্বাভাবিক দেখানোর ভঙ্গি করি। তবে মনে হলো, গন্ধটা ইতিমধ্যে আমাকেও ধীরে ধীরে গিলে নিচ্ছে। ফলে অনুভব করলাম, গন্ধটা এখন অনেকটা কম। সারা ঘরটা ধরে ধরে সাজানো বড় বড় বস্তা। কেনরকমে তার পাশ কাটিয়ে একটু ভেতরে ঢুকতেই তিন-চার হাতের

এক ফালি ফাঁকা জায়গা পেলাম। 'পিঠের ব্যাগটা আমার ব্যাগের ওপরই রাখতে পারিস।' আমার কৌতূহল আর প্রশ্নে ভরা চোখের দিকে তাকিয়ে ও বলল, 'ওগুলো শুটকি মাছের বস্তা। বেশিরভাগটাই লুট্রা মাছের।' ঘরের উণ্টোদিকের দরজা ঠেলে বয়স্ক এক মহিলা ঢুকলেন। 'কি রে এদিনি পর, ঘরে না যায়া এখানে ফিরিয়া আইলু!' ইস্পাত কঠিন এবং চোয়াল ঠেলে ওঠা ঘাম চপচপে একটা মুখ। অথচ নরম পালকের মত মাতৃসুলভ মেহে বিকাশকে তিনি বললেন।

বিকাশ বলল, 'বৌদিকে ফোন কর্তিনি'?

'কই, বউতো করনি।' চিন্তিতভাবে ধীরে ধীরে তিনি বললেন।

'জানি, ওঠি তোমাদের কাউকে পাবেনি। তাই সোজা চলিয় আসসি।'

'ভালো কথা। কিন্তু ওকে তো ঠিক চিনিনি।' আমাকে দেখে মৃদু হেসে, বিকাশকে তিনি বললেন। উভয়ের কথোপকথনে বুঝলাম, উনি বিকাশের মা। ওনার পেছনে কোন একজনের ছায়া হওয়ার ভাসছে। দেখলাম পৌষের নরম সামুদ্রিক বাতাস, ওই অজ্ঞাতনামার চুলগুলোকে অস্থির করে তুলেছে। ছায়া কি কথা বলে! মনে হয় কোন কোন সময় হয়তো সে কথা বলে।

'আমি যেখানে কাজ করি, সেখানে ও নতুন কাজে ঢুকেছে।' তারপর আমাকে দেখিয়ে বিকাশ বলল, 'ওর নাম নীলেশ।'

তবে আমার দৃষ্টি তখন অন্য জায়গায় আটকে রয়েছে। দরজার অন্তরালে যিনি রয়েছেন, মনে হলো তিনি একজন মহিলা। কিন্তু, তিনি কে?

'উটা পাগল। কুন কাজেই অর মন নাই। শুধু উড়া উড়া ভাবনা।' বিকাশের কথায় মা ওকে মৃদু ধমক দিয়ে বলে, 'তুই ধাম ত। এমন সুন্দর বাবুটাকে তুই পাগল কটুট।'

'আপনি ভাববেন না মাসিমা। ও অনেক কিছুই বলে।'

'অনেক কিছু মানে।' মাসিমা বিকাশকে হাত দিয়ে মৃদু ঠেলে দিয়ে বলেন।

'দেখ মা। আমানকের রক্তে না হয় জোয়ার-ভাটার স্রোত বরাটে। চোখে অঁখে গাজের ন্যাশা। কিন্তু অর...।'

মাসিমা হঠাৎ গভীর হয়ে যান। আবার কি ভেবে একটু অনামনস্ক ভাবেই

কললেন, 'অর মানে কী?' তারপর কৌতূহলী চোখে একবার আমার, একবার ওর মুখের দিকে তাকাত্তে থাকেন। অন্তরালের ছায়াটা এবার যেন বেশ পড়ে চড়ে উঠল।

'দেখ, ও যদি পাগল না হয়, তাহলে আমার সঙ্গে কি এখানে গাঙপাখির মত হঠাৎ ভেসে পড়তো?'

ছায়ার কায়টা দেখলাম ক্রমশঃ বড় হচ্ছে। ছাঁচে ঢালা একটা নিবৃত্ত মুখ। অস্থির চুলগুলো তার স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে। কিন্তু তার চোখ দুটোয় শূন্যতা গ্রাস করেছে। আমি তাকাই। কিন্তু পারি না সে চোখের ব্যাকুলতার কাছে ধাঁড়াতে। চোখ নামিয়ে নিতে বাধ্য হই। মাসিমাকে দেখলাম দীর্ঘশ্বাস ফেলে দরজার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন।

'বাঃ! ভালো কটুটু।' মেয়েটির ঠোঁটের কোণে তখন মৃদু তাক্সিলেয়ার হাসি। 'অঁথৈ গাঙ যদি তর নাশা হয়! তবে তুই কি করির পারলু পালিয়ে যাইতে, শঙ্কনু নিরাপদ দূরে।' হঠাৎ কয়েকটা মুহূর্ত যেন সমুদ্রের গর্জন থেমে গেল। পলকহীন চোখে বক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। ধীরে ধীরে বিকশ বলল, 'বৌদি! কি ইইছে তোর? মুখ-চখ তোর এমুন লাইগছে কেন?'

'কথা ঘুড়াউটু কেন ছেটল?' ঠোঁটের কোণে আবার সেই তাক্সিলেয়ার হাসি। 'আচ্ছা ঠিক করিয় ক ত। আমাকে কেমন দেখবু তাকলু তুই।' মনে হলো গলার স্বরটা অস্বাভাবিক কাঁপা কাঁপা। অস্তিত্বের নিষ্ক্রিয়তা যেন তার শরীর ও কণ্ঠায় করে পড়ছে। আমি ঠিক বুঝতে পারি না, আমার কর্তব্য এখানে কী? আমাদের থেকেও বয়সে মনে হলো উনি অনেক ছোট। কিন্তু কথার ও ভঙ্গিমায় মনে হলো আমাদের থেকেও সে অনেক এগিয়ে রয়েছে।

সময়ের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে সূর্যটা কখন যে মধ্যবেলার এসে দাঁড়িয়েছে, বুঝতেও পারিনি। সে ঘরের প্রতিটি কোণায় আলো ছড়িয়ে দিয়ে আমাদের সজাগ করতে চাইলো। বোধহয় সময়ের কথা ভেবেই।

'কি ইইছে মা?' ধীরে ধীরে বিকশ মার কাছে গিয়ে জানতে চাইল। নির্বিকার-ভাবে মাসিমা ওর দিকে তাকিয়ে কলল, 'দরিয়ায় নূতন এক ধীপের খুঁজ পাওয়া গেইছে। মূদের চকের সব খাইছে সেটি।' তারপর তিনি মুহূর্তে গর্জতে থাকা অনন্ত

নাগরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পেরায় মাস তিনেক ইই গিইছে! কবি যে তর দাদা আইসবে, জানিনি'।

সমুদ্রের গর্জনের সাথে সাথে, শৌ-শৌ শব্দে অনবরত সমুদ্র থেকে উঠে আসা হাওয়া, এই নুরে পড়া ঢালাগুলোকে যেন নাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। 'ঘরের পেছনে জল রাখা আছে। তুমানে হাত মুখ ধুয়া করিয় ঘর আইশ'। আমাদের উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলে, বৌদি পাশের ঢালার ভেতর চলে গেলেন।

'কদিন ইইল বউর শরীরটা ভালো নই। বাচ্ছটা সৌ যে গেল, এখনো কিরেনি। বউর বয়টও ত কম। অখন কি যে করব।' আমাদের মুখের দিকে তাকায়। দেখলাম, সাগরের মত টলটল করছে ওনার সেই চোখে চিন্তার কালো মেঘ।

পর পর ক-বছর সুখি মত মাছ মারতে না পারায়, মাছ-মারাদের মধ্যে এক হতাশা গ্রাস করছিল। এদিকে আড়তদার ও মহাজনের কর্জ, ওদেরকে অস্থির করে তুলেছিল। দৃষ্টান্ত ও অস্থির জীবন নিয়ে, সমুদ্রের মাথার ভাসতে ভাসতে একদিন বিকাশের দাদা দিশম্বরের মধ্যে জেন চেপে গেল। নৌকা ভর্তি স্বপ্ন নিয়েই তবে সে ঘরে ফিরবে। নোনা বাতাস ওদের মাতাল করে দিল। শক্ত করে ধরা হাল, শক্ত শরীরে ও চোখে মুখে তার অন্য এক দিশা! অঁথৈ সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে সূর্য কখন যে অস্ত গেছে খেয়ালও করেনি তারা। একটা পাতলা অন্ধকার সবে হুমাওড়ি দিচ্ছে। এমন সময় তারা দেখল, কচ্ছপের পিঠের মত দূরে কিছু ভাসছে। যত এগিয়েছে, ততই স্পষ্ট হয়েছে ওদের আবিষ্কার। জনমানব শূন্য মোহনায়, জেগে ওঠা একটা চড়। যা ছোট্ট ধীপের মত আকার নিয়েছে। বিকাশদের চকের সেই মাছ মারার দল সেখানেই যাপন করতে শুরু করলো।

মাসিমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমাদের ঘরের মাঝি মনকে এই ইইছে পুড়া কপাল। বেটা ছেলেরা নুয়া বাতাসের নাশায় ভাসিয়া বেড়াটে। আর মাইছি—মনে ঘরের নাওয়ায় পড়িয় ছটফট করেটে।'

মাসিমা কথাগুলো আমাদের লক্ষ করেই বললেন। হয়তো, ধীরে ঘরের মেয়েদের জীবন-যন্ত্রণার অনুভূতির নির্যাস এভাবে বলে কিছুটা হৃদয় হতে চাইলেন। আমি সামাজিক বৈষম্যে ভরা এই জীবন কাবোর রক্ত জমির ওপর হঠাৎ এসে পড়েছি। কয়েক মুহূর্তে এসে পড়া জমিতে আমাকে আমি বুঝতে থাকি...।

ওই আবার। বার বার। পৌষের সামুদ্রিক দমকা বাতাস, এই চালাগুলোকে খুঁটি ধরে যেন নাড়িয়ে দিচ্ছে। দিন পড়িয়ে আঁধার নামার সাথে সাথে সমুদ্রের চেহারাটাও গেল পাশে। ভয়ঙ্কর গর্জন করতে করতে এক একটা ঢেউ দরজার গোড়ায় এসে আছড়ে পড়তে লাগল। বারে বারে মনে হতে লাগল, আগের ঢেউটার থেকে এবারের ঢেউটা বোধহয় আরো কাছে আছড়ে পড়লো। চমকে উঠি আর ভাবি, যদি ঘুমিয়ে পড়ি, এবং বড় একটা ঢেউ এসে এই চালার ওপর আছড়ে পড়ে, তাহলে! একটা আলাদা অনুভূতি ও ভয় আমাকে যেন ঘিরে ফেলছে। যারা সমুদ্রে জেপে ওঠে চড়ার গিয়েছিল, তাদের মধ্যে আমিও আজ ফিরে এসেছি। জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় রসদ নিয়ে যাওয়ার জন্য। তবে তার একর পক্ষে সব নিয়ে যাওয়া সম্ভব না হওয়ায়, অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই নতুন ঘাঁপের উদ্দেশ্যে বিকাশকেও আজ ভেসে যেতে হয়েছে।

তার যাওয়াটা কিছুতেই মনে নিতে পারছিলাম না, মাসিমা ও রেখা বৌদি। সমুদ্রের অবিরত গোপ্তানি, রেখার ভেতরের অবরুদ্ধ গোপ্তানির সঙ্গে যেন একাকার হয়ে যাচ্ছে। চলার একটা খুঁটি ধরে পলকহীন চোখে সে অকূল দরিয়ার পাশে চেয়ে থাকে। স্নান হয়ে আসছে দিনান্তের রঙ। একটা নরম বাতাস বিধাদের মতো বইতে শুরু করলো।

আমার জীবনে এ এক নতুন অধ্যায়। বিকাশের হাত ধরে তা শুরু হয়। কিন্তু বিকাশ আমাকে অপ্রত্যাশিত এমন এক পরিস্থিতির মধ্যে রেখে যাবে, তা ভাবতেও পারিনি। ধীর-শূন্য খাঁ-খাঁ বালিয়াড়ির এই চকে, হাতে গোনা কয়েকজনের মধ্যে আমি একজন। আমার শিক্ষা অভিজ্ঞতা এখানে শূন্য। কি করবো প্রায়-শূন্য এ পুরীতে! এই পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে আমি বেমানান। এখানে আমার কোনও প্রয়োজন নেই।

‘বাবু নীলেশ! ঘরের দরজাগুলো ভালো করিয় বন্ধ করি দে।’ আমি সস্থিত ফিরে পাই। সঙ্গে একটা কাজও। আমি শশব্যস্ত হয়ে জনলাহীন ঘরের দরজার দিকে ছুটে বাই। দেখি বাইরে তখন সাদা শুভ্রার মত কুয়াশা আমাদের নুয়ে পড়া চালাগুলোর ওপর নেমে আসছে। মাসিমা আমার প্রয়োজনীয় রাতের খাবার ঘরের এক কোণে ঢেকে রাখছেন। রেখা বৌদি একটি জ্যারিকেন অতিসন্তপণে আমার

ঘরের নির্দিষ্ট একটি স্থানে রেখে দিচ্ছেন। এবং সারা রাতের প্রয়োজনীয় একান্ত চুক্তিকি সামগ্রীও।

‘দেখ ত নীলেশ, বউর কপালটা পুড়েটে কি না!’ ... আমি চকিতে রেখার দিকে তাকাই। ঘোমটা খোসে পড়া মুখ। কোলকাতার দেখেছি বিভিন্ন কল্পিত দেব-দেবীর মুখাবয়ব। ইতিহাস বলে, মানুষ যেভাবে নিজেকে দেখেছে বা ভেবেছে, ঠিক সেভাবেই কল্পিত দেবদেবীর মূর্তি গড়েছে। ফলে সময় ও সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে নিজেনের শরীর ও মুখাবয়বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দেবীমূর্তিও পাশেটেছে। গড়ে তুলেছে সুন্দর ও আধুনিক পেলব-আকর্ষণীয় মূর্তি। সাত-সতেরো পেরিয়ে সাগরের একান্ত বেলাতুমিতে রেখা বৌদিকে দেখি। অবহেলা ও অযত্নের মধ্যেও নিটোল এক খোদিত দেবীমুখ।

কপালে হাত নিই। স্বভাবিকের থেকেও মনে হলো একটু বেশি গরম। মাঝি-মালাদের জল মাপার মত, পলকহীন চোখে সে আমাকে মাপে! মাসিমা কাছে সরে এসে বললেন, ‘কি বুজছ বাবু?’

‘টেম্পারেচার স্বভাবিকের থেকে একটু বেশি।’ ‘ওঃ!’ মাসিমা উৎকণ্ঠা ভরা মুখটা নামিয়ে নিলেন এবং আপন মনে বিড়বিড় করে কি বলতে বলতে পাশের ঘরের দিকে চলে গেলেন। মনে হলো, দৃষ্টিস্ত্র ওনাতে কুরে কুরে যাচ্ছে।

বাইরে নিটোল অন্ধকার। সেই অন্ধকারে জেনাকিরা ডুব সাঁতার মগ্ন! ঘরের কোণে রাখা জ্যারিকেনের আলো, থাকে থাকে সাজানো গুটিকি মাজের বস্তায় বাধা পেয়ে, এক আলো-আঁধারির জ্যামিতিক আঙ্গল তৈরি হয়েছে! ঘাড়ের ওপর হঠাৎ এক গরম হাওয়ায় আমি চমকে উঠি। তাকিয়ে দেখি রেখা বৌদির আগনের মত গরম নিঃশ্বাস আমাকে দগ্ধ করছে! কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই ও স্বপ্ন করো আমার হাতটা ধরে ওর বুকের উঁচু নিটোল অহংকারের উপর চেপে ধরল! চকিতে ওর পলকহীন চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, কোনও ক্ষুধার্ত বাঘিনী! তার শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার মুহূর্ত ওপছে। সমুদ্রের গর্জন ছপিয়ে শুধু টিপ্ টিপ্ একটা স্বপ্ন কানে এসে লাগলো। একটু সস্থিত ফিরতেই বুকলাম, ওটা আমার হার্টবিটের শব্দ। বস্তার গায়ে চেপে ধরা শরীরটা — বাঘিনীর থাবার নিচে নাড়ানোর ক্ষমতা আমি হারিয়ে ফেললাম!

আমার বিস্ফারিত চোখের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'হ্রস্ব কত ট, কি বুজল?' আমার নির্বাক মুখের দিকে তাকিয়ে ও খিল খিল করে অদ্ভুত এক হাসি হেসে উঠল। তারপর একছুটে ঘরের বাইরে অন্য ঘরে, সে কুরাশার চান্দর জড়িয়ে চলে গেল। খোলা দরজা পেয়ে পৌষের ঠাণ্ডা বাতাসের দাপট তখন সারা ঘরের দখল নিল। ছেয়ের তৈরি দরজা ভালো করে বেঁধে দিই। হেগলার মাদুরে, বহুদিন না খোয়া চান্দর ও তেলচিটে বালিশে শরীরটাকে সঁপে দিলাম। বিকাশ ছাড়া এখানে নিজেকে বড় অসহায় মনে হল। সময়ের গতি কি কমে যায়? তবে কেন আজ কাটিতে চাইছে না সময়? কালকের আগে বিকাশ ফিরবে না। কিন্তু এ-সময়...!

আমি বিকাশ আর রেখা বৌদির আজ সারা মধ্যবেলা সমুদ্রের গা ধরে হেঁটেছি। বিকাশ বলেছিল, একটা সময় অসম্ভব প্রাণোচ্ছল ছিল রেখা বৌদি। চোখদুটো ছিল তার সাগরের মতো। কিন্তু দিনে দিনে রেখা বৌদি পান্টে গেল এ-দিনের মত। চোখ দুটো এখন তার মাছের মতো। আজ যতক্ষণ হেঁটেছি কিন্তু তার দৃষ্টি আটকে ছিল অঁখে সমুদ্রের ও গ্রাস্তে!

বিকশ বলল, 'মাকেও সেই জেট্রিবেলা থেকে দেখেছি। ওভাবেই সেও তাকিয়ে থাকতো। তাই মা, আমাদের নিয়ে দেখেছিল অন্য এক স্বপ্ন! ভর্তি করেছিল স্কুলে। আর সব সময় আগলে আগলে রাখতো। গাজের বাতাস যাতে আমাদের গায়ে না লাগে।'

বাবার ছিল গাজের সঙ্গে নাড়ির টান। বহুরের অর্ধেকটা সময়ই সে গাজের জলে কাটিয়ে দিতো। ডাক্তার থেকে জলে যাওয়ার দিন, মা তাকে খুব করে বলতো 'আর কটা দিন রও না গো। ছুওয়ালগুলা যা ন্যাওটা হইছে! আর সামলাতি পারিনি।'

'উপায় নাই বৌ। ঘরে রওয়ার কুন উপায় নাই।'

'যখন তুমি রওনি। বাবার জালায় ছুওয়ালগুলা যখন ভুয়ে পড়ির গড়াগড়ি খায়, তখন আমার মরির যাইতে ইচ্ছা হয়।'

'তুই একটু বুঝ বউ। আড়ন্তের টাক শোধ দিতে না পারলে, মোর জালা জুরাবেনি।' দেখতাম, বাবা কথাগুলো বলে মার দিকে অসহায়ের মত তাকিয়ে থাকতো। মা খুব চেষ্টা করতো বাবাকে আর কটা দিন ধরে রাখতে। কিন্তু সে প্রত্যেকবারেই আমাদের ঘুম ভাঙার আগেই চুপি চুপি বেরিয়ে যেতো, নোনা

বাতাসের টানে। তারপর চার-পাঁচ মাস পরে যখন সে ফিরতো হাতে একটা বড় মাছ। মুখে তার চওড়া হাসি। টগবগ করে তখন সে আনন্দে ফুটছে।

তবে সে আনন্দের লহরও কয়েকটা মাস যেতে না যেতেই থেমে যেতো। আবার গাজের ডাক তাকে অস্থির করে তুলতো। সে মাকে আশ্বাস দিয়ে বলতো, 'এবার দেখবু বউ। আড়ন্তের টাক ঠিক শোধ করিম দুবো। আরো গভীর গাঙে ভাইসব। দেখি, মাছ কি করিম পলায়ে থাকে।' তার চোখে তখন আকাশের মত স্বপ্ন ভাসে। এভাবেই একদিন চুপি চুপি বাপটা চলে গেছিল। অনন্ত সাগরের ডাকে, আমাদের ঘুম ভাঙার অনেক-আগে। তারপর সে আজও ফেরেনি।

সেদিন, মা আমাদের দু ভাইকে শক্ত করে ধরে বাঁচতে চেয়েছিল। চেয়েছিল কিভাবে ডাক্তার আমাদের আটকে রাখা যায়। তাই সবসময় সে আশঙ্কিত থাকতো। মায়ের ভয় ও দৃষ্টিভঙ্গি দেখে, ধীরেধীরে সব ঘাটের খবর রাখা বিন্দু মাসি একদিন বলল, 'বড় ছেলটরে বে দে, শহরি পাঠিয়ে দে। সে কাজ কর, খাউ। দেখবু একদিন জলের টান কমিয়া গিইছে।'

কথাটা মার ভালো লেগেছিল। আমাদের গ্রামেরই মেয়ে রেখা। তাই অল্প কথায় অল্পদিনের মধ্যেই দাদা ও রেখা বৌদির বিয়ে হয়ে গেল। তারপর একদিন শহরেও তারা গেল। কিন্তু মন থেকে সাগরকে তাড়াতে পারলো না। তাই একদিন সে পালিয়ে গেল। অনেক বৌজার পর কদিন বাসে আমিরুল কাকার সঙ্গে সে ঘরে ফিরল। তবে তার চোখে তখন, নোনা বাতাসের নেশায় তখনো ঘোর লেগে রয়েছে।

একটানা কথা বলায় বিকাশ হাঁফিয়ে উঠেছিল। দু'জনেই বালিমাড়ির চরে বসে পড়ি। রেখা বৌদি আমাদের দেখে। তারপর হমড়ি খেয়ে থাকে চালার দিকে সে ধীরে ধীরে চলে গেল। বিকাশ উত্থাল পাখাল ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে। কিন্তু আমি স্থির থাকতে পারছি না। বিকাশের কাছে আরো কিছু শোনার আশায় ছটফট করতে থাকি। 'নীলেশ, তুমি কিছু বলবে?' ও আমার অস্থির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল। 'না, মানে, তারপর দাদা—' ওর ঠোঁটের কোণে অমায়িক করুণ এক হাসির রেখা দেখে, আমি থেমে যাই।

'দাদা। তারও সেই একই পথ। একই স্বপ্ন। আড়ন্তারের করুণা শোধ দিয়ে, নৌকা কিনবে, জাল কিনবে। তাই তাকে আরো মাছ মারতি হবে। আরো গভীর

সমুদ্রে ভেসে যেতে হবে।' বিকাশ খামে। তারপর ভাবগষ্ঠীর ভাবে নিজের মনে কথা বলার মত সে বলতে থাকে, 'কিন্তু সে তো জানে না! তার শ্রমের ওপর কাদের কর্তৃত্ব রয়েছে।'

আমি অবাক বিষয়ে ওর কথা শুনি। ওর ভাবনার গভীরতা, সত্যি আমাকে প্রেরণা দেয়। 'কি দেখছি?'

'তোমাকে?'

— 'নতুন কিছু'

— 'হ্যাঁ' ও অদ্ভুত হাসিটা আবার হাসে। 'আমাদের নতুন করে ভাবা উচিত। গতকাল যারা আমাদের পাশে ছিল। সুখ-দুখে ভাগিদার বলে। আজ সময়ের পরিবর্তনে তাদের অনেকেই আড়তদার, মালিক ও প্রমোটার হয়েছে। যদিও তাদের বর্ণ আজও এক। কিন্তু বগটি পাল্টে গেছে।'

এ এক ট্রাজিক জীবন। বিকাশের সঙ্গে না এলে এবং ওর কথা না শুনেলে আমি হয়তো কোনদিন জানতেও পারতাম না। মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে জীবনকে জিনিয়ে আনা। আবার সেই জীবনটাকেই এ ডাঙার ধোপার পটায় আচ্ছাদিত থাকে, আমাদের চেনা এই ব্যবস্থা।

সূর্য ডোবার খানিক আগে, আমিরুল কাকা আর বিকাশ তাদের নাওয়া— গভীর গাঙে ভেসে গেল। দরজায় কেউ কি ধাক্কা দিল? হয়তো আমার মনের ভুল। রাতের বয়স বাড়ার সাথে সাথে হাওয়ার দাপটও বেড়েছে। 'নীলেশ, গুনতি পাইচ্ছ, নীলেশ।' বিছানা থেকে উঠে বসি। হ্যাঁ, হাওয়ার সঙ্গে অন্য একটা শব্দও ভাসছে।

দরজার দড়িটা খুলতেই সমুদ্রের গর্জন আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। মরা চাঁদ কটা কটা রেখায় সমুদ্রের ওপর লাফাচ্ছে। নিটোল অঙ্ককারের মধ্যে কুয়াশা মাটির কাছকাছি নেমে এসেছে। এবং নেমে এসেছে অসংখ্য ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকিও।

'মাসিমা! কী হয়েছে?' দরজায় মাসিমা। হঠাৎ তিনি আমার হাতটা শক্ত করে ধরে, এবং কিছু কলার আগেই হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল, 'বউ কোন সাড়া-শব্দ নিচ্ছে নি।'

চমকে উঠলাম ওনার গলার স্বর শুনে। মনে হলো কোনও কারণে তিনি খুব ভয় পেয়ে গেছেন। 'সাড়া দিচ্ছে না মানে।' কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার মুখ। সে মুখ থেকে সহসা কোনও উত্তর পেলাম না।

— 'রেখা বৌদি কোথায়?'

— 'ঘরে।'

ঘরে। সম্ভ্রমের কথা মনে পড়তেই হঠাৎ শরীরের মধ্যে অন্য এক উত্তেজনার তাপ অনুভব করলাম। চোয়াল শব্দ হয়। চিন্তা যদি বিবেকবর্জিত হয়, তবে নীচে নামার কোনও তল থাকে না। মনে মনে প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হই।

মথারাতের অশ্রুট তারা। আমাকে দেখে মিটিমিটি হাসছে। ক্ষুধার্ত রাত। অতৃপ্ত সময়। আমি কি সময়ের ডাকে সাড়া দিতে পারবো? বিশ্ব-বিশ্বে উদ্বেলিত মন। বিশ্বাসরণের আশঙ্কার পথ হাঁটে।

একি, তত্ত্বপোষের ওপর রেখা বৌদি ওভাবে পড়ে আছে কেন? বিদ্যুতের তরঙ্গের মতো অজানা আশঙ্কার শরীরের মধ্যে হিমশীতল স্রোত বয়ে গেল।

'কি হয়েছে?' উত্তর পাওয়ার জন্য অপেক্ষা না করেই ছুটে ঘরে ঢুকলাম। কপালে হাত দিই। অসম্ভব গরম। জ্বরে জ্বান হারিয়েছে। মথারাত। নিভৃত বেলাভূমি। শুধু রাতপাখির ডাক থেকে থেকে সমরকে জানান দিচ্ছে। বিপুল দিশাহীন হাফাকারের মাঝে অর্থহীন আমি, উদ্ভল সমুদ্রের মতো সময়, বিশ্বাসহীনতায় জর্জর। রেখা বৌদি পাশ ফেরে। দেখে এবং আচ্ছন্নতার মধ্যে আমার হাতটা শক্ত করে ধরে। শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পারি না সে হাত সরিয়ে নিতে।

হঠাৎ আচ্ছন্নতার মধ্যেই প্রলাপের মত সে বলতে থাকে, 'আমিও তোর সাথে ভাসিয় যাবো ... ডেউয়ের মাথায় লাচন দেখব... দেখব... ভাঙা চাঁদের কিকিমিকি...'

বুকলাম দাদার চিন্তা; মানুষগুলোকে নিঃশর্ত নিষ করে দিয়েছে।

মাটিতে চটাই বিছিয়ে মাসিমা একরশ দৃষ্টিস্তা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। মানুষের আবেগ, ভালোলাগা, ভালোবাসা কবে যে এক মুক্ত আকাশ পাবে। জানি না। জানি না কবে বিকাশের দাদা-বৌদি দরিয়ায় দেখবে, — ভাঙা চাঁদের কিকিমিকি।

'বাবু! ও বাবু! নামবে নি।' গায়ে হাত দিয়ে কে যেন ডাকলো। তাকাই, একি, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সামনে তাকাই, আমি ছড়া ভেসেলেব ডেক সম্পূর্ণ ফাঁকা।

সব যাত্রী কোথায় গেল? নেমে গেল? 'আপনাকে অনেকক্ষণ ধরে ডাকতিছি।'
— ভেকের খালাসিটি বলল। দূরে তাকাই। সূর্যটা ঘুম জড়ানো চোখে তাকিয়ে
আছে। হয়তো আমার জন্য অপেক্ষা করছে। উঠে দাঁড়াই। ভেসেল থেকে নেমে
আসি। সূর্যটা তখন গাঙের জলে ধুমাতে যাচ্ছে।

হাসিমা আসার সময় অশ্রুট ঝরে বলেছিল, 'আবার আইস বু ত বাবু!' আমি
জোরে জোরে মাথা নেড়েছিলাম। কিন্তু কোনও উত্তর দিতে পারিনি।

পারিনি রেখা বৌদির কথায়ও কোনও উত্তর দিতে। তবু সমুদ্রের মত
হাস্যকার তুলে সে বলেছিল— 'আমি বাঁচিয় রইব ত'?

বিশ্বায়নের শিকার

হর্ষবর্দ্ধন চৌধুরী

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হলো। প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল
নেহরুর মাধ্যমে দূশো বছরের উপনিবেশিক শাসন ও শোষণে এবং দেশ
বিভাজনের ফলে বিপর্যস্ত ভারতকে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী ও
স্বাধীননির্ভরশীল করার দায়িত্ব। কী করে? সামনে উদাহরণ রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিক
পরিকল্পনা। মেঘনাদ সাহার উদ্যোগে সুভাষ বসুর সভাপতিত্বে কংগ্রেস
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রস্তাব করেছিল। সেই পরিকল্পনা কমিশনের সভাপতি
ছিলেন জওহরলাল। ১৯৪১ সাল থেকে শুরু হলো ভারতে পরিকল্পিত
অর্থনীতির যাত্রা। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় খাদ্যের উপর, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক
পরিকল্পনায় শিল্পের উপর জোর দেওয়া হল। গড়ে উঠল ভাটিনাঙ্গাল, হীরাবুদ,
দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের বাঁধ। সেচ ও জলবিদ্যুতের জন্য, বোকারো, দুর্গ
ভিলাই-এ গড়ে উঠল ইস্পাত শিল্প, ইন্দিরা গান্ধী এসে করুলা শিল্প, ব্যাঙ্ক
জাতীয়করণ করলেন। কিন্তু রাশিয়ায় সমাজবাদ পতনের সাথে আমেরিকার
বাজার অর্থনীতি প্রাধান্য পেতে থাকল। যদিও এই বাজার অর্থনীতির ফলে
১৯৩০ অর্থনৈতিক জগতে ধস নেমেছিল। পরিকল্পিত অর্থনীতির বিরুদ্ধে
গান্ধীতো ছিলেনই তার পেছনে ছিলেন শিল্পপতিরা। ১৯৩৬ সালে একবার চেষ্টা
হয়েছিল। ১৯৮৫ সালে রাজীব গান্ধী টেলিকম শিল্পে বেসরকারি শুরু করলেন।
১৯৭৮ সাল থেকে ম্যাকিনসে ত্রৈমাসিক লেখা হতে থাকল অর্থনৈতিক
উদারীকরণ করলে ভারতের উন্নতির হার ১০% হবে। আর ১৯৮৫ সাল থেকে
ভারতে ব্যালেন্স অব পেমেন্ট (আমদানি রপ্তানির উৎস) কমতে থাকে। ১৯৯১
সালে বৈদেশিক মুদ্রার সংকট এত কমে আসে যে তা দিয়ে মাত্র তিন সপ্তাহের
প্রয়োজনীয় বৈদেশিক দ্রব্য আমদানি করা যেতে পারে। ফলে ভারত আন্তর্জাতিক

